যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা
গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান !
পেয়েছি যা' কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি',
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

নানা সারস্বত প্রতিষ্ঠান হইতে বহুপদক প্রাপ্ত
এবং 'সংস্কৃত স্তোত্র সংগ্রহ' প্রণেতা
শ্রীজহরলাল বসু বি, এল,

কলিকাতা ১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটস্থ আইডিয়াল প্রেস হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীজহরলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত
পোঃ কুতরুন (হুগলী)

আষাঢ়, ১৩৪৩

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় এবং বন্ধুগণের স্নিগ্ধ আনুকূল্যে আমার সুদীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ "বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস" আজ বঙ্গভাষাপ্রিয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। যদি ইহা সুধীগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় এবং তরুণ বঙ্গভাষাসেবকগণের সাধনপথের কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়ক হয়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইবে এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমার এই পুস্তকমুদ্রণের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস নিবেদন করিতে চাই। বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষার উপর একটা সহজ টান ছিল; নানা কৌশলপূর্ণ কবিতা অপেক্ষা সরলভাবে বক্তব্য-প্রকাশক গদ্যের দিকেই আমার বালক মন অধিক আকৃষ্ট হইত এবং অধিক তৃপ্তিলাভ করিত। যখন জানিলাম কোন কোন মনীষীর অভিমত যে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য মাত্র একশত বৎসর হইল উদ্ভূত হইয়াছে, তখনই মনের মধ্যে সংশয় জাগিয়া উঠিল—যে ভাষায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পদ্য রচনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কথোপকথনের জন্য, বিচিত্র মানবজীবনের শতবিধ কর্ম্মসম্পাদনের জন্য যে একটা গদ্য-বিভাগ ছিল না—মনটা ইহা মানিতে রাজি হইল না। মনের মধ্যে বিপুল কৌতূহল ও অদম্য উৎসাহ লইয়া শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র-জ্ঞানসাধ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঐ সময়ে (১৯০৫ সালে) উত্তরপাড়া Aryan Institution নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'বঙ্গভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষিত হইল। কলেজে অধ্যয়নের অবসরে শিক্ষার্থী বালকের চেষ্টায় তখন পর্য্যন্ত যে সামান্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া উক্ত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম ; এবং ফলে, প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি রজত পদক লাভ করিলাম। অতঃপর বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে নূতন তথ্য সংগ্রহে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ক্ষুদ্র পক্ষী যেমন তাহার বাঞ্ছিত কুলায় নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট সাহায্যে এক একটি করিয়া তৃণ আহরণ করে, আমিও আমার অধ্যয়নের এবং পরে ওকালতির অবসরে বাঞ্ছিত বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বমনীষি-গণের রচনা হইতে কিছু কিছু তথ্য মিলিল, বহু লাইব্রেরীর পুঁথি হইতে অনেক পাইলাম, হাইকোর্টের পুরাতন দপ্তর হইতে কিছু দলিল দস্তাবেজের সন্ধান মিলিল। ঐ সময়ের মধ্যে আরও কয়েকবার প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম এবং প্রত্যেকবারেই প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি করিয়া পদক লাভ করিলাম। তন্মধ্যে দুইটী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য বিষয়ক : প্রথম, কলিকাতা সারস্বত গ্রন্থাগার বিঘোষিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' এবং দ্বিতীয় চন্দননগর দেশবন্ধু পাঠাগার বিঘোষিত 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' বিষয়ক। ঐ দুই প্রতিযোগিতাতেও আমার ভাগ্যে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ আরও দুইটী পদক লাভ ঘটিল।

অতঃপর কয়েকজন প্রীতিস্নিগ্ধ বন্ধুর প্রেরণায় ঐ সকল উপকরণ লইয়া "বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। বন্ধুগণের উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক মুদ্রণে আমার আগ্রহ ও সাহস জন্মিত কি

না সন্দেহ। ইঁহারা মুদ্রণ কার্য্যেও পাণ্ডুলিপি সংশোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য প্রীতির সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আমি অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী।

এই পুস্তকে অনুশীলিত সাহিত্যিকগণের নাম অধিকাংশস্থলে তাঁহাদিগের আবির্ভাবকালের অনুক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বিড়ম্বনা অনেক; পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের লেখকগণের আবির্ভাবকাল বা তাঁহাদিগের উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের প্রথম প্রকাশের সন তারিখ অনেকক্ষেত্রে অপরিজ্ঞাত; আর, যদি বা অধুনাতন অনুসন্ধিৎসু মনীষিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে উক্ত সন তারিখ অনেকটা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা লইয়াও মতভেদ বিস্তর। অতএব, এইরূপ অবস্থায় অবিচ্ছিন্নধারায় সন তারিখের অনুক্রম বজায় রাখা যে কত কঠিন, বা যে স্থলে ঐরূপ তারিখ লইয়া মনীষিগণের মধ্যে মতের বিষম অনৈক্য—সে স্থলে স্বয়ং একটা তারিখ অভ্রান্ত মানিয়া লইয়া অপরটী বাতিল ও নামঞ্জুরকরা যে কতদূর ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসের কাজ করা হয়—তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাহাও করিতে হইয়াছে। যে সকল স্থলে ঐরূপ সন তারিখের মতভেদ দেখা গিয়াছে সে সকল স্থলে সম্ভবমত বিচার বিবেচনাপূর্ব্বক যে মতটী গ্রহণীয় মনে করিয়াছি সেইটীই গ্রহণ করিয়াছি। তবে অভ্রান্ত তথ্যনির্ণয়ে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; শ্রীরামপুর পাদ্রীকলেজ হইতে পুরাতন পাদরী সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়জানিতে পারিয়াছি; ঐরূপ বাঁকুড়া পাদ্রী কলেজ, বেনারস মিশন, উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি হইতে এই পুস্তকের উপকরণ আহরণ করিয়াছি।

বোধ হয় সন তারিখের যাথার্থ্য নির্ণয়ে বিশেষ অসুবিধা ছিল বলিয়াই

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেকেই সন তারিখের অনুক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। আমি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার পূর্ব্বে আর কেহ এই পদ্ধতির অনুসরণে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন কি না তাহা আমার জানা নাই।

কেবল মৌলিক রচনাদ্বারা কোন ভাষাই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। সকল দেশের ভাষাই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে ত্রিবিধ উপায়ের সহযোগে—**অনুবাদ, উদ্ভাবন** এবং **অনুকরণ**। বাঙ্গালা সাহিত্যও পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে এই ত্রিবিধ উপায়ের সহযোগে। তবে, উক্ত সকল উপায়ই যে প্রত্যেক সাহিত্যসেবী কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে —তাহা নহে; কেহ শুধু অনুবাদদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেহ বা মৌলিক উদ্ভাবন দ্বারা, আর কেহ বা মাত্র অনুকরণ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সংসাধন করিয়াছেন। আবার কেহ বা একাধিক উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে কে কোন্ উপায় অবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যের কতদূর সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন এই পুস্তকখানি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই পুস্তকখানির একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ও পুস্তকখানির প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়া লেখককে তাঁহার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকখানিকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বর্জ্জিত করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। ইতি—

ভদ্রকালী, দোলতলা
স্নান পূর্ণিমা, ১৩৪৩ সাল } **শ্রীজহরলাল বসু**

পুস্তকখানির সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমতঃ—

রায় বাহাদুর ডাক্তার **দীনেশচন্দ্র সেন** বলিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু প্রণীত বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের ফাইল কাপি খানি পড়িয়া দেখিলাম। এই বিষয়ে সম্প্রতি সুশীলবাবু, সুকুমার বাবু, শিবরতন বাবু, প্রিয়রঞ্জন বাবু, কুমুদনাথ বাবু প্রভৃতি লেখকেরা কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন, স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'বঙ্গবাণী' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে বঙ্গ গদ্য-সাহিত্যের অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বাঙ্গলার পদ্য ও গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে বাঙ্গলা ভাষায় দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল, এই পালাগুলির মাঝে মাঝে গান থাকা সত্বেও সেগুলি মূলতঃ গদ্যেই লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, ইংরেজীর অনুকরণে আমরা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা এই যাত্রার পালা-সাহিত্যে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঠিক বিলাতী আদর্শে রচিত না হইলেও নাটকের ধরণের লেখার সঙ্গে বাঙ্গালীরা খুবই পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া রূপকথা ও গীতি-কথা খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দী হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, লিখিত আকারেও তাহাদের নিদর্শন একবারে দুষ্প্রাপ্য নহে।

সহজিয়া সাহিত্য অতি প্রাচীন এবং বিপুল, নিত্যানন্দ প্রভুর পর হইতে কত যে গদ্য-পদ্যময় সহজিয়া পুঁথি লিখিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যেক বৈষ্ণব বাবাজীর ঝুলি পরীক্ষা করিলে এই সাহিত্যের নমুনা কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে।

আরও দুইটি বিষয়ে অনেক গদ্যানুবাদ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাধাবল্লভ শর্ম্মা গদ্য স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও লেখক অনেক মূল্যবান অভিমত সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। লেখকের এই উদ্যম বঙ্গ সাহিত্যের অনেক ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখককে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে তাহার সন্দেহ নাই। আশা করি সুধীসমাজ ও সাধারণ পাঠক উভয়েই তাঁহার পুস্তকের প্রকৃত উৎকর্ষ ও মর্য্যাদা অবধারণে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল **ডাক্তার সতীশচন্দ্র বাগচি** বলিয়াছেন :—

আজ বাঙ্গালা দেশ কথাসাহিত্য ও গীতি কবিতায় যে পরিমাণে পরিপ্লাবিত তার অনুপাতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের মাল মশলা বাঙ্গালায় আজিও এক রকম নাই বলিলেও চলে। বরং পদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের মাল মশলা আজকাল কতক পরিমাণে সমাহৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় শ্রীমান জহরলাল বসু বাঙ্গালায় গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন বলিতেই হইবে। শ্রীমান জহরলাল আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র; পূর্ব্ব হইতেই আমি তাঁহাকে খুব মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া জানি। তবে, বঙ্গ-ভাষার প্রতি যে তাঁহার এত প্রগাঢ় অনুরাগ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

কোনও ভাষার সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লেখা যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর পরিশ্রম সাপেক্ষ। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তের মালমশলা একেতো নাই বলিলেই চলে, আর যাহা আছে—তাহাও নিতান্ত বিক্ষিপ্ত; সেই বিক্ষিপ্ত এবং নিতান্ত সামান্য মালমশলা হইতে নিজের অমিত পরিশ্রম এবং বিশেষ গবেষণার সাহায্যে তিনি যে এক বিপুলকায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের রীতিমত ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন—ইহা তাঁহার খুব বেশী কৃতিত্বের এবং যোগ্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। নিজে আইন ব্যবসায়ী হইয়াও অবশিষ্ট সময়কে এইদিকে নিয়োজিত করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে অমূল্য রত্ন উপহার দিয়াছেন তাহার জন্য বঙ্গভাষাসেবী চিরদিন তাঁহাকে মনে রাখিবে।

বলা বাহুল্য, অধুনা এই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বাঙ্গালা সাহিত্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট; দ্বিতীয়তঃ এখনও আমরা অনেকেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা সেবীগণের পরিচয় বা নাম পর্য্যন্তও জানি না। শ্রীমান জহরলাল তাঁহার এই পুস্তকে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের স্তরগুলি অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রস্তাব্য বিষয় প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ নির্দ্দেশ করায়—আলোচ্য বিষয়টাকে অতি যোগ্যতার সহিত বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থরাজি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতের একত্র সমাবেশ এবং বিচার ও আদ্যন্ত সমগ্র লেখকগণের আবির্ভাব কালানুক্রমে বিশ্লেষণ বিন্যাস—এই দুইটী তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এইরূপে সময়ের অনুক্রমে সমস্ত বইখানি সাজাইতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই; কারণ এ পন্থা অনুসরণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে কোন সমালোচক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অনুশীলন করেন নাই। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

তাঁহার এ পুস্তক বিদ্যার্থী, অধ্যাপক এবং বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠকবৃন্দ—সকলেরই নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে আশা করি। এবং ইতিপূর্ব্বেই এই সকল বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি স্বর্ণ রৌপ্যের যে কয়খানি পদক লাভ করিয়াছেন, তাহাও এ পুস্তকখানির সারবত্তার যথেষ্ট পরিচায়ক। উপসংহারে বক্তব্য এই যে পুস্তকখানি আমারই একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের রচিত বলিয়া আমি নিজেকেও গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি এবং ইহার বহুল প্রচার সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, রায় বাহাদুর **খগেন্দ্রনাথ নাথ মিত্র** এম এ, বি এল, বলিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত জহর লাল বসু প্রণীত 'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' পাঠ

করিয়া আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই অভাব অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে অনেক স্থলে প্রতি বৎসর যে সাহিত্য প্রকাশিত হয়, তাহারও একটি সমালোচনামূলক ইতিহাস বাহির করিবার রীতি আছে। অবশ্য নিত্যনূতন যে সাহিত্য জন্মলাভ করিতেছে, তাহার সবই যে স্থায়ী হইবে, তাহা নহে: কিন্তু ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইলে সাহিত্যের প্রত্যেকটি তরঙ্গ লক্ষ্য করিতে হইবে। জহরলাল বাবু আধুনিক সাহিত্যের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমার মনে হয় যে ইহা ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **প্রিয়রঞ্জন সেন** বলিয়াছেন :—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জানিবার জন্য ও জানাইবার জন্য পাঠক ও লেখক, উভয়ের মধ্যেই আজকাল উদ্যোগ দেখা যাইতেছে; ইহা প্রশংসার বিষয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের অংশ এত অল্প, যে তাহার কথা এতদিন আলোচিত হয় নাই,—এবং সেই জন্য আমাদের প্রাচীন বাংলা গদ্যের সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাতে বাড়ে তাহা সর্ব্বথা করণীয়। উত্তরপাড়া বাস্তব্য শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু মহাশয় প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের পরিচয় দিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত আলোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়, ভারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদের কথা বলিয়া ইংরাজী আমলের বাংলা গদ্য সাহিত্যের সুষ্ঠু পরিচয় দান করিয়াছেন। জহরবাবুর বিবরণীর বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে প্রভূত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ছাত্র শিক্ষক ও অন্য যাহারা বাংলা সাহিত্য আলোচনার অনুরাগী তাঁহাদের সকলেরই ইহা কাজে লাগিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। জহরবাবুকে তাঁহার পুস্তকের মাল মসলা সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে,—উৎকৃষ্ট পুস্তকা-

গারের একান্ত অভাব ইহার কারণ। তৎসত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁহার প্রবল অনুরাগ আছে বলিয়াই তিনি এই দুরূহ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া তাহা সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **সুকুমার সেন** বলিয়াছেনঃ—

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু রচিত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য দেখিলাম। জহরবাবু অনেক পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। গত শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং কত সাহিত্যিক গদ্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক অবগত নহেন। জহরবাবুর পুস্তক প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার উপাদান পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠক উপন্যাস এবং কিছু কিছু কবিতা ছাড়া অপর কোন বই পড়ে না। বর্ত্তমান সময়ে এই রুচির পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যাইতেছে। সেই জন্য মনে হয় যে জহরবাবুর বই প্রকাশিত হইলে সাধারণ পাঠকের নিকট আদৃত হইবে। বইখানি বি, এ, এবং এম-এ পরীক্ষার্থীরও বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া বোধ হয়।

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **তারাপদ মুখোপাধ্যায়** বলিয়াছেনঃ—

মাননীয় শ্রীযুক্ত জহর লাল বসু মহাশয় একখানি অমূল্য গ্রন্থ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থিত করিতেছি। সাধারণ সৌজন্য বা প্রীতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসি নাই; ভাষা জননীর সেবাকল্পে তিনি যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহাতে সত্যই তিনি বঙ্গভাষার সেবকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কথা-সাহিত্য ও গীতিকবিতা পরিপ্লাবিত আধুনিক বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে লেখক

যে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন ইহাতেই তিনি ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। সাহিত্যের প্রতি 'প্রাণের টান' না থাকিলে কখনই তিনি অর্থোপার্জ্জন বা উপস্থিত করতালির মোহ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে অবতীর্ণ হইতেন না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নীরস কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও লেখক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিতগণের জ্ঞানগুঞ্জন মুখরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের গবেষণামন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হন নাই, তাহাতে তাঁহাকে আমাদের সাধুবাদ প্রদান করিতেই হইবে।

তাঁহার গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় না হইলেও বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য; বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের গ্রন্থের এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই পুস্তকে লেখক সর্ব্ববিষয়ে অভ্রান্ত না হইলেও গদ্য সাহিত্যের স্তরগুলি বিশদ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন যুগের প্রচুর বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া তিনি একদিকে সাহিত্যরসিকগণের যথেষ্ট মনের 'খোরাক' যোগাইয়াছেন, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষানুশীলন-নিরত ছাত্র গণের জন্য নানা আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ পাঠকগণেব জন্যও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বস্তুরও ইহাতে অভাব নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমি সমালোচক নহি; আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্যক্ বিশ্লেষণ আমার সাধ্যাতীত এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি বলিয়াই গ্রন্থ খানির আবির্ভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতেছি এবং পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন গ্রন্থখানি একবার নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক করিয়া তুলেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ এটর্ণী শ্রীযুক্ত **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত** এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন বলিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু প্রণীত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' পাঠ

করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় উহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রয়োজন। ঐরূপ গ্রন্থ এতদিন ছিলনা। জহরবাবুর গ্রন্থে সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইবে।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকে ছয়যুগে বিভক্ত করিয়াছেন—আদিযুগ, মুসলমানযুগ, প্রথম ইংরেজ সংস্পর্শের যুগ, বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ। এই যুগানুযায়ী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে বিন্যস্ত করিতে এবং প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে গ্রন্থকারকে অনেক অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও ব্যাপক অধ্যয়নের সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল ও সরস এবং গ্রন্থনের প্রণালীও উৎকৃষ্ট। কয়েকজন অভিজ্ঞ লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া এবং আদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের গদ্য রচনার অনেকগুলি কৌতুকপ্রদ নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া জহরবাবু গ্রন্থের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আশা করি এ গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইবে এবং শীঘ্রই আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব। ঐ সংস্করণের জন্য আমি দুইটি বিষয়ে গ্রন্থকারের মনোযোগ আকর্ষণ করি—

(১) আধুনিক যুগের বঙ্গগদ্য-সাহিত্যকে গ্রন্থকার যে তিন উপযুগে বিভক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ—যুগ-প্রবর্ত্তক ঐ তিনজন মনীষীর গদ্য রচনায়ও একটা বিবর্ত্তনক্রম আছে। আমার অনুরোধ গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ ক্রম যথাসম্ভব প্রদর্শন করিবেন।

(২) জহরবাবুর গ্রন্থে অনেক খ্যাতনামা গদ্য লেখক লেখিকার নাম (বোধ হয় অনবধান বশতঃ) উল্লিখিত হয় নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের এই ত্রুটি ক্ষালিত হইবে এবং লেখকদিগের পরিচয় বিশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত না হইয়া, হয় কালানুক্রমে নয় বর্ণানুক্রমে (তাঁহাদের রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকাসহ) সন্নিবিষ্ট হইবে।

প্রবীণ সাহিত্যিক সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত **কৃষ্ণকুমার মিত্র** বলিয়াছেন :—

জহরলাল বাবু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস ছয়যুগে বিভক্ত করিয়াছেন :—আদিযুগ, মুসলমান যুগ, ইংরেজ লেখকদিগের যুগ, বিদ্যা-সাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ। * * * এই ছয়যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ক্রমোন্নতি হইয়াছে, জহরলালবাবু বহু সংখ্যক প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন; এবং সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় স্বাধীন ভাবে তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের বিবরণ যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের গবেষণার ফল এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে চান এই গ্রন্থ তাঁহাদিগের বিশেষ সহায়তা করিবে। * * * *

জহরবাবু তাঁহার গ্রন্থে প্রত্যেক যুগে বাঙ্গালা গদ্যের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশেষে বর্ত্তমান যুগের গদ্য-সাহিত্যে যে বীভৎস দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দেশের মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য সম্রাটকেও চক্ষুলজ্জায় মার্জ্জনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সৎসাহস দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। * * * *

খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর **সত্যকিঙ্কর সাহানা** বি, এ, বিদ্যাবিনোদ বলিয়াছেন :—

কোমল সৌন্দর্য্যে ও ভাবনৈপুণ্যে বঙ্গভাষা আজ জগতের ভাষা-পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, শক্তিমান বঙ্গমনীষীগণের গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্মে জগতের আভিজাত্যসম্পন্না ভাষারাণীদের উচ্চমঞ্চে আজ বঙ্গবাগেদবীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাষা জননীর এই মহিমোজ্জ্বল মুহূর্ত্তেও তাঁহার ধীর সন্তানগণের মনে একটা শঙ্কার শিরা মাঝে মাঝে পীড়া দিতে থাকে। বঙ্গভাষার লেখকগণ বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রগল্প, কথা-সাহিত্য, গীতিকবিতা প্রভৃতি বিষয়ে যে ভাবে আত্মনিয়োজন করিতেছেন

তাহার আংশিক ভাবেও ভাষার মহত্ব ও ভারত্ববর্দ্ধক দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতিতে সময় নিয়োগ করিতেছেন না ; * * * মনীষা সম্পন্ন বহু সুপণ্ডিত বঙ্গসন্তান বঙ্গভাষা সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ বিশেষ মূল্যবান কতক গুলি পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গভাষাভাষীকে তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিলেও, বঙ্গভাষার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু * * "বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যেব ইতিহাস" রচনা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। * * * যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী বহুলেখকের দ্বারা * * বঙ্গসাহিত্যেতিহাসের অনেক উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি বহু আকারে বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত থাকায় সে সকল সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের বাহিরেই পড়িয়া রহিয়াছে। জহরবাবুর দীর্ঘকালের শ্রমসাধনায় এবং বিচার আলোচনায় বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের যে একটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইল সেজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। আমার বিশ্বাস এই গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস বাঙ্গালী পাঠকের, বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণের নিকট বঙ্গ-গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সংবাদ বহন করিবে এবং উদীয়মান তরুণ লেখকগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই একজনেরও মনে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণতর ইতিহাস রচনার প্রেরণা দিবে।

মান্যবর রায় বাহাদুর **স্যর সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়** কে, টি, সি, বি, ই, এম, এ, বি, এল, এম, এল, এ, বলিয়াছেন :—

* * * Your History of Bengali Prose Literature is as full of valuable informations as charming in language and descripton. It is really a gigantic work, requiring untiring patience, stupendous diligence and marvelous ability. It will, I doubt not, be of as much use to the students as also to the professors of Bengali Literature, and I have every confidence that your Book will be duly appreciated.

"অমৃত বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন ;—Stotra-Sangraha ; or Gleaning of Sanskrit Hymns by Jahur Lal Bose pp. 60, price 8 annas. To be had of the author, Uttarpara, Bengal.

This Book contains a beautiful collection of the best known Sanskrit Stotras (Hymns). The editors have spared no pains to make the book particularly useful to persons of all descriptions. Below the hymns are subjoined short notes in Bengalee ; and then a free translation of the whole in elegant Bengalee. Those who do not know Bengalee but want to have an insight into the spirit of the Sanskrit Hymns will be no less benefited by this book in view of the fact that it contains among other things a fine English rendering of the hymns. Considering its merits, we think the book has been quite moderately priced. [10th February, 1935.]

ভূমিকা

বঙ্গভাষা আজ বিশ্বসাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে। ইহা বাঙালীর গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে, বঙ্গসাহিত্যসেবীদের অনেকেই এখন ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ, কবিতা প্রভৃতির রচনায় বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। যশোলাভ বা অর্থোপার্জনের জন্যই যে তাঁহারা এসব লিখিয়া থাকেন তাহা নয়। তবে এগুলির দিকে লোকের ঝোঁক খুব বেশী। কথা-সাহিত্য রচনার নব নব ধারাও উদ্ভাবিত তথা অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু যে অনুপাতে ছোট গল্প, উপন্যাস বা গীতিকবিতা-বিষয়ক পুস্তক অধুনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে তাহাদের তুলনায় ভাষার মহত্ত্ববর্ধক দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমালোচনা প্রভৃতি-বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয় মাত্র! বলা বাহুল্য ঐ সকল বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের পুস্তকের যথেষ্ট অভাব অদ্যাপি বিদ্যমান! একে বাঙলায় সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম, তাহার উপর আবার গদ্য-সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক আরও কম।

বাঙলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অদ্যাবধি যে সকল উপকরণ সমাহৃত হইয়াছে সেগুলি অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকের তুলনায় কিছুই নয় বলিলেও চলে। বাঙলা গদ্যের রীতিমত ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বঙ্গভাষায় কয়খানা আছে? তাহার মালমসলা কোথায় মিলিতে পারে, তাহার

জন্যই বা কয়জন সাহিত্যসেবী চিন্তা করেন ? এ কথা খুব জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙলা গদ্য-সাহিত্য ব্যাপারের এখনও যথেষ্ট তথ্য অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। বঙ্গভাষাসেবিগণ এ বিষয়ে যত মনোযোগ দেন, বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহুদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু যতদিন বাঙলা ভাষা থাকিবে ততদিন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহাকে বাঙলা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক-রচনার পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। অধুনা সাহিত্য-বিষয়ক অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম অনেককে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের খণ্ড-ইতিহাস কয়েকখানি রচিত হইলেও, একখানি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু আজ বহুদিন পরে সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিলেন ; ইহা-দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নের কিছু সাহায্য হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ে প্রচুর উপাদান থাকিলেও, প্রাচীন গদ্য-বিষয়ক মালমসলার যথেষ্ট অভাব ; আর যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কাজেই সাধারণের সহজলভ্য নহে। অনেকে সে সমুদয়ের সন্ধানও জানেন না। নিজে আইনব্যবসায়ী হইয়া আইন-অধ্যয়নদ্বারা অর্থোপার্জনবৃদ্ধির লোভসংবরণ করিয়া জহরবাবু সুপণ্ডিতগণসেবিত বঙ্গসাহিত্যের গবেষণামন্দিরে প্রবেশপূর্বক বহু পরিশ্রমে বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্য-বিষয়ক নিগূঢ় তথ্য সমূহ নানা স্থান হইতে

সঙ্কলন করিয়া সমগ্র গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এ পরিশ্রম যথেষ্ট প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি প্রমাদশূন্য না হইলেও, ইহা তাঁহার তীক্ষ্ণ সমালোচনা-শক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক। প্রাচীন গদ্যরচনার বিবিধ বিষয়ে বহুদৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত করায় পুস্তকখানি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। জহরবাবুর পুস্তকে বর্ণিত ইংরেজ যুগের লেখকদিগের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও, উহাতে বহুপ্রাচীন গদ্যলেখকের রচনাবলী পুঞ্জীকৃত থাকায় পুস্তকখানির সারবত্তা যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে।

জহরবাবুর পুস্তকখানির আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে সাহিত্যিকগণের কালানুক্রমিক ধারা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে কাজের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এরূপ ধারা অন্যত্র বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য-বিষয় মধ্যে নির্দিষ্ট না থাকায়, বঙ্গভাষা সাধারণের চক্ষে তেমন আদরের বা গৌরবের সামগ্রী ছিল না। সে সময়ে যাঁহারা বঙ্গভাষার পরিচর্যা করিয়াছিলেন তাঁহারা মাত্র সাহিত্যিক প্রেরণার বশেই করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ বঙ্গভাষা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য বিষয় মধ্যে নির্দিষ্ট। কাজেই বঙ্গ-ভাষা আজ ছাত্রদের অবহেলার বা খেলার সামগ্রী নহে। বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসও এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য মধ্যে নির্দিষ্ট। সমগ্র বাঙ্‌লা-গদ্য-সাহিত্যের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব আছে। জহর-বাবুর এই পুস্তকে পরীক্ষার্থীদের অভাব, সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকটা দূর হইবে। তাঁহার পুস্তকখানি সাহিত্যামোদী এবং শিক্ষার্থিগণের নিকট সমধিক আদর লাভ করিলে আমি সুখী হইব। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ

করিয়া কৃতী সাহিত্যসেবিগণ এ বিষয়ে আরও অনেক পুস্তক রচনা করিলে বাঙ্‌লা-সাহিত্যের প্রকৃত সম্পদ্‌ ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইবে। ইতি—

বিদ্যাসাগর কলেজ
কলিকাতা } শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
বাঙ্গালা গদ্যের যুগ বিভাগ	..	১
আদিযুগ	...	২
বাঙ্গালাগদ্যের আদিম অবস্থা	...	২
শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র ঘোষের মত	...	৩
রূপগোস্বামীর কারিকার নমুনা	...	৪
ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত	...	৬
ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মত	...	৭
প্রাচীন বাঙ্গালা ন্যায়শাস্ত্র	...	৮
কৈলাস চন্দ্র ঘোষের মত	...	৯
কুমুদনাথ দাসের মত	...	১০
বঙ্গাক্ষর সম্বন্ধে রমেশ চন্দ্র দত্ত	...	১১
কেদারনাথ মজুমদারের মত	...	১২
পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা রচনা বেশীর-ভাগই পদ্যে	...	১৩
রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ	...	১৫
১৫১৫ খৃষ্টাব্দের একখানা পত্রের নমুনা	...	১৬
১৭১৭ খৃষ্টাব্দের একখানা দলিল	...	১৭
১৬৩১ খৃষ্টাব্দের একখানা পত্রের নমুনা	...	১৭
দ্বিতীয় যুগ	...	২০
দ্বিতীয় যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ	...	২০
শিবরতন মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত পুরাতন দলিল দস্তাবেজের নমুনা		২০
দাসসাসী বিক্রয়ের দলিল	...	২১
আত্ম বিক্রয় পত্র	...	২৪

তারকেশ্বরের মোহন্তর মামলা সংক্রান্ত প্রাচীন দলিল পত্র ২৫
রাজা ভারামল্লের ছাড়পত্র সন ৭৮৫ সাল ... ২৫
চৈতন্য সম্প্রদায়েব বাঙ্গালা রচনা ... ২৮
বৈষ্ণব কবিদিগের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য ... ২৯
রাগময়ী কণা ... ৩০
রস নির্ণয় ... ৩১
নরোত্তম ঠাকুরের আশ্রয় নির্ণয় ... ৩৪
বৃন্দাবন দাসের গোলক সংহিতা ... ৩৬
আশ্রয় নির্ণয় বা ভজন নির্ণয় ... ৩৬
আত্ম নিরূপণ ... ৩৭
সায়েস্তা খাঁর সময়ের একখানা জীর্ণ দলিল ... ৩৯
[illegible] কাহিনী—"কাশীর বর্ণনা" .. ৪০
[illegible]শাস্ত্র—জ্ঞানাদি সাধনা ... ৪০
প্রাচীন বাঙ্গালা গন্ত স্মৃতিগ্রন্থ ... ৪১
প্রাচীন বাঙ্গালার বক্তা বীরভদ্র গোস্বামী ... ৪২
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) ... ৪৩
কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৭৫) ... ৪৩
মুন্সী জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান (১৭৫০ ?) ... ৪৪
বাঙ্গালায় আরবী পার্সীর বাহুল্য ... ৪৫
তৃতীয় যুগ ... ৪৭
ইংরেজ আগমনে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিবর্ত্তন ... ৪৭
১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের একখানা বাঙ্গালা পত্র ... ৪৮
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের একখানা দানপত্রের নমুনা ... ৫১
পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পরের মোচলিকা পত্র ... ৫২

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা দলিলের নমুনা ... ৫৩
"কামিনী কুমার" ... ৫৩
ইংরেজ যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য ... ৫৪
বাঙ্গালা ভাষায় সাহেব লেখক ... ৫৪
ন্যাথানিয়েল হালহেড (১৭৫১—১৮৩০) ... ৫৬
হালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৭৭৮ ... ৫৬
চার্লস উইল্কিন্স্ (১৭৫০—১৮৩৬) ... ৫৭
অতি প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক ... ৫৭
মানুএল-দা-আসসুম্প্‌ সাউ ... ৫৮
হেন্‌রি ফর্ষ্টার (১৭৬৬—১৮১৫) ... ৬০
শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র ... ৬২
উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯—১৮২৩) ... ৬৩
জন, এফ, এলার্টন (১৭৬৮—১৮২০) ... ৬৩
ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ (১৮০০) ... ৬৪
বিলাতে মুদ্রিত একখানা গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রের অনুলিপি ৬৫
প্রাচীন শিশুবোধক—রচনার নমুনা (১৮০০) ... ৬৬
মিলারের বাঙ্গালা অভিধান ... ৬৭
উইলিয়ম কেরি (১৭৬১—১৮৩৪) ... ৬৭
কথোপকোথন (১৮০১) ... ৬৮
বঙ্গসাহিত্যে কেরি সাহেবের স্থান ... ৬৯
ইতিহাসমালা (১৮১২) ... ৭০
বাঙ্গালা অভিধান (১৮১৫—১৮২৫) ... ৭১
ফেলিক্স কেরি (১৭৮৬—১৮২২) ... ৭২
মোহন প্রসাদ ঠাকুর ... ৭৬

রামরাম বসু ... ৭৭
প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) ... ৭৮
লিপিমালা ... ৮১
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২—?) ... ৮২
বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ... ৮৩
হিতোপদেশ (১৮০৮) ... ৮
রাজাবলী (১৮০৮) ... ৮৫
প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩) ... ৮৭
গোলকনাথ—হিতোপদেশ (১৮০১) ... ৯০
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ... ৯১
হাণ্টার সাহেব—বাঙ্গালার জাতিভেদ (১৮০৪) ... ৯৯
চণ্ডীচরণ মুন্সী—"তোতা ইতিহাস" ... ৯৫
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—"মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" ৯৬
হরপ্রসাদ রায় ... ৯৭
কাপ্তেন রিচার্ডসন (১৮০১) ... ৯৮
জন, ক্লার্ক, মার্শম্যান (১৭৯৪—১৮৭৭) ... ১০০
ডাক্তার উইলিয়ম ইয়েটস্ (১৭৯২—১৮৪৫) ... ১০৩
ইয়েটস্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৪৯) ... ১০৬
পদার্থ বিদ্যাসার (১৮২০) ... ১০৭
জন, ডি, পিয়ার্সন (১৭৯০—১৮৩১) ... ১০৯
প্রাচীন মহিলা লেখিকা ... ১১০
রাসসুন্দরী ... ১১০
বৃন্দাবন পরিক্রমা (১৮ ১১) ... ১১৫
বৃন্দাবন লীলা ... ১১৭

ইংরেজ যুগে হাতে লেখা পুথির অনাদর	…	১১৯
পরিষৎ-প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	…	১২০
রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩)	…	১৩৪
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫—১৮৪৪)	…	১৩৮
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৪—১৮৭৩)	…	১৩৯
প্রমথনাথ—"নববাবু-বিলাস" (১৮২৩)	…	১৩৯
নব-বিবি-বিলাস	…	১৪১
এই যুগের অন্যান্য পুস্তক	…	১৪২
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১—১৮৫৮)	…	১৪২
রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫)		১৪৬
কালীকমল সার্ব্বভৌম—"বগুড়া বৃত্তান্ত" (১৮৫০)	…	১৪৬
রেভারেণ্ড জেম্স্ লং (১৮১৪—১৮৮৭)	…	১৪৭
প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩)	…	১৪৭
রামারঞ্জিকা	…	১৫২
হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭—১৮৪৪)	…	১৫২
ডব্লিউ ওব্রাএন স্মিথ—"পৌরাণিক ইতিবৃত্ত" (১৮৭০)	…	১৫৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫)	…	১৫৪
আত্মচরিত	…	১৫৫
পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩)	…	১৫৭
ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৫৮)	…	১৫৮
মহাজ্জিদ শা (১৮৫৯)	…	১৫৮
হতভাগ্য মুরাদ (১৮৬১)	…	১৫৮
শিবজীর চরিত্র (১৮৬২)	…	১৫৯
বিদ্যাসাগর-যুগ	…	১৬১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) ... ১৬১
কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (১৮২০—১৮৮৫) ... ১৭০
মহারাজ মহাতাব চাঁন্দ (১৮২০—১৮৭৯) ... ১৭০
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০—১৮৮৪) ... ১৭১
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) ... ১৭২
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২১—১৮৯১) .. ১৭৪
কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২—১৮৯২) ... ১৭৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) ... ১৭৫
প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী (১৮২৫—১৮৮৬) ... ১৭৭
ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—১৮৯৪) ... ১৭৭
রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬—১৯০০) ... ১৭৯
দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—১৮৭৩) ... ১৭৯
তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০—১৮৮৫) ... ১৮০
রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১—১৮৯৪) ... ১৮১
ব্রহ্মমোহন মল্লিক (১৮৩২—?) ... ১৮২
সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—১৮৮৯) ... ১৮২
কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩৫—১৮৯০) ... ১৮২
গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬—১৮৮৯) ... ১৮৩
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬—১৯১০) ... ১৮৩
চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৭—১৯১৭) ... ১৮৪
হরিমোহন প্রামাণিক (১৮৩৮—১৮৭৩) ... ১৮৪
কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪) ... ১৮৪
বঙ্কিম-যুগ ... ১৮৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪) ... ১৮৫

ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯—১৮৯৩)	...	২০৫
কালীময় ঘটক (১৮৪০—১৯০০)	...	২০৬
সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৪০— ?)	...	২০৬
জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২—?)	...	২০৬
শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪২—১৯১১)	...	২০৭
কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪২—১৯১১)	...	২০৭
বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২—১৯১১)	...	২০৭
কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১)	...	২০৯
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩—?)	...	২১৫
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১২)	...	২১৫
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪—১৯১৪)	...	২১৮
চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১৪)	...	২১৮
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (১৮৪৪—১৯১৯)	...	২২১
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪৪—১৯০৯)	...	২২১
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৯১)	...	২২২
রামদাস সেন (১৮৪৫—১৮৮৭)	...	২২২
রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—?)	...	২২৩
চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬)	...	২২৪
অক্ষয় চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭)	...	২২৪
রামকমল ভট্টাচার্য্যের ‘দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ’	...	২[illegible]২
নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)	...	২[illegible]
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৮৮৬)	...	২৩৬
শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)	...	২৩৭
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)	...	২৩৭

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) ... ২৩৮
সারদা চরণ মিত্র (১৮৪৮—১৯১৭) ... ২৩৯
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫) ... ২৩৯
প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯০০) ... ২৩৯
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১) ... ২৩৯
কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন (১৮৪৯—১৯০২) ... ২৪০
রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯—১৯০০) ... ২৪১
রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১—১৮৯৯) ... ২৪৩
দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫২—১৯০৭) ... ২৪৩
উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২—১৮৯৮) ... ২৪৩
অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯) ... ২৪৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১) ... ২৪৪
দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৩—?) ... ২৪৫
যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু (১৮৫৪—১৯০৫) ... ২৪৫
কৈলাস চন্দ্র সিংহ (১৮৫৫—১৯১৮) ... ২৪৮
রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫৫—১৮৯৩) ... ২৪৮
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫—১৮৯৭) ... ২৪৯
নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫—১৯০১) ... ২৪৯
বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫—১৯২১) ... ২৪৯
অখিলনাথ রায় (১৮৫৬—১৯৩২) ... ২৫০
অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬—১৯২৩) ... ২৫০
যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭—১৯২৭) ... ২৫০
স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯৩২) ... ২৫১
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৭—১৯১৭) ... ২৫১

জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী (১৮৫৮—১৮৯৪) ... ২৫১

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯০৯) ... ২৫২

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৫৯—১৯১৩) ... ২৫২

বর্ত্তমান যুগ .. ২৫৪

(ক) রবীন্দ্র সম্প্রদায়ের ভাষা ... ২৫৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—) ... ২৫৪

(খ) দ্বিজেন্দ্র সম্প্রদায়ের নাটকীয় ভাষা ... ২৮৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩) ... ২৮৫

(গ) শরৎচন্দ্র ও তৎসম্প্রদায়ের ঔপন্যাসিক ভাষা ২৯১

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—) ... ২৯১

বর্ত্তমান যুগে ভাষায় পঙ্কিলতা ... ৩১০

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১—১৯০৭) ... ৩১৭

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—) ... ৩১৮

রায় বাহাদুর জলধর সেন (১৮৬১—) ... ৩১৮

বিবেকানন্দ স্বামী (১৮৬২—১৯০২) ... ৩১৮

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২—১৯১৬) ... ৩১৮

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬২—) ... ৩১৯

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৩—১৯২২) ... ৩১৯

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩—১৯২৭) ... ৩১৯

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪—১৯২৪) ... ৩২০

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৫—) ... ৩২০

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (১৮৬৫—১৯০২) ... ৩২০

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬—) ... ৩২০

নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬—) ... ৩২১

রমণীমোহন মল্লিক (১৮৬৬—১৯০৫)	...	৩২১
পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬—)	...	৩২১
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭—১৯২৩)	...	৩২২
ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮—১৯২৯)	...	৩২২
জগদীন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮—১৯২৫)	...	৩২২
জগদানন্দ রায় (১৮৬৯—)	...	৩২২
সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯—১৯১২)	...	৩২৩
রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯—)	...	৩২৩
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৬৯—১৯২১)	...	৩২৩
দীননাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭০—)	...	৩২৩
কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০—)	...	৩২৩
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০—১৯২০)	...	৩২৪
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭২—১৯৩১)	...	৩২৪
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬—)	...	৩২৪
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—)	...	৩২৪
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭—)	...	৩২৫
নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতী (১৮৮১—১৯১০)	...	৩২৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২)	...	৩২৫
বর্ত্তমান যুগের অন্য লেখকগণ	...	৩২৫
কৈফিয়ৎ	...	৩২৬
বঙ্গভাষার বর্ত্তমান সম্পদ্	...	৩৪৪
পরিশিষ্ট	...	৩৪৭
বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আরবী পার্শী শব্দ	...	৩৪৭
বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দ	...	৩৫৪

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস

পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তকে সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগকে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : চৈতন্য দেবের অবির্ভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃঃ পর্য্যন্ত) আদ্যকাল ; ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৭৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত) মধ্যকাল ; এবং তৎপরে বর্ত্তমান কাল।

বাঙ্গালা গদ্যের যুগ বিভাগ—

অধুনা অনেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং এখন সমস্ত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে ভাগ করিতে গেলে মোটামুটী হিসাবে ছয়ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় ; মুসলমান রাজত্ব কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **আদিযুগ** ; রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **দ্বিতীয় যুগ** বা **মুসলমান যুগ** ; এই যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ বাঙ্গালাতে যাবনিক শব্দের প্রাধান্য ; তৎপরে

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **তৃতীয় যুগ** বা **ইংরেজ লেখকদিগের যুগ**; বস্তুতঃ ইংরেজ-লেখকদিগের যত্ন, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও আনুকূল্যের ফলে বাঙ্গালাভাষার প্রভূত উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে; তৎপরে বঙ্কিমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **চতুর্থ যুগ** বা **বিদ্যাসাগরের যুগ**; তদনন্তর **বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ**; তারপর **বর্ত্তমানযুগ** বা **রবীন্দ্রনাথের যুগ**। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের এই ছয়টী যুগ একে একে আলোচিত হইবে।

আদিযুগ

বাঙ্গালা গদ্যের আদিম অবস্থা—

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আদিম অবস্থা ঘোর-কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। অতিপূর্ব্বকালে সাধারণ লোকেরাও যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত তাহাও বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাকৃতের মিশ্রণ মাত্র। বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানালোকের নানা মত। কেহ বলেন, বাঙ্গালা একটী পৃথক্ ভাষা, বরাবর না হইলেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই আছে; ইহা ক্রমবিকাশে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আবার বঙ্কিমবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন "বঙ্গভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই ওঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দি মারাঠি প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়।"

বাঙ্গালা ভাষা যে হাজার বছরের পুরাতন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় সেন-বংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেন

প্রায় হাজার বৎসর আগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত যে সমস্ত দানপত্র ও অনুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে সে সমুদয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মাঝামাঝি একপ্রকার অক্ষরে লিখিত। রাজা চন্দ্রবর্ম্মার সময়কার লিপিও অনেকটা বাঙ্গালার কাছাকাছি। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরের সূত্রপাত হইয়াছে।

আবার শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেনের মতে বঙ্গভাষা বহু প্রাচীন ভাষা: "আধুনিক ইউরোপের কোন ভাষা হইতেই বঙ্গভাষা নবীন বা অল্পজীবী নহে। * * খ্রীষ্ট জন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বেও বালক বুদ্ধদেবকে বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন, দেখিতে পাই। * * এই বঙ্গভাষা খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ শতাব্দীতে দণ্ডাচার্য্যের ব্যাকরণ মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে।"†

শ্রীযুক্তকৈলাশচন্দ্র ঘোষের মত—

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে কোন গদ্য গ্রন্থকার ছিলেন না তাহা সত্য নহে। * * বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ গীতি রচনা করিলেও দুই চারিটী গদ্য লিখিতেও বিরত হন নাই। * * গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। * * গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিবন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন—

যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে
কোটি হি কোটি শ্রবণ পর পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে।

† বঙ্গবাণী—পৃষ্ঠা ২

সোরস শুনি নাগর বর-নারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন
রসময় চম্পূ বিথারি

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্যপদ্যময় কাব্য; তাহা হইলে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রণীত গদ্যপদ্যময় কাব্য পাঠ করিয়া ছিলেন। * * বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস কবি বন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন—

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম
জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্যপদ্যময় গীত
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিল
রায় স্বরূপ সহিত।

রূপগোস্বামীর কারিকার নমুনা—

ইহাতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদ্যের ন্যায় অনেক গদ্যও রচনা করিয়াছিলেন। * * বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন বঙ্গভাষায় আদি পদ্য লেখক তেমন তাঁহারা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক। * * রূপগোস্বামী 'কারিকা' নামে যে গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, * * তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম; পুস্তকখানির প্রারম্ভ বাক্য এই প্রকার—'শ্রীশ্রীরাধা বিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচ-গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে,

রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে, স্পর্শগুণ অঙ্গে ; এই পঞ্চ গুণে পূর্ব্বরাগের উদয়—পূর্ব্বরাগের মূল দুই ; চিত্র দর্শন ও অকস্মাৎ বংশীশ্রবণ।' ইত্যাদি * * গদ্য রচনার উৎপত্তি ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছে।" আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"অনেকে বলেন রামমোহনই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। যে সময়ে বাঙ্গালা পদ্যের উৎপত্তি, ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গালা গদ্যেরও জন্মলাভ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেরূপ প্রথম বাঙ্গালা কবিতা লেখক—তাঁহারা সেইরূপই ইহার আদি গদ্য লেখক। তৎপরবর্ত্তী শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভৃতি চৈতন্যসহচরগণ পদ্যের ন্যায় গদ্যেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন ; তাঁহাদের পর কথক সম্প্রদায় ইহার অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করেন। * * আবার প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, রাজাবলী, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রামমোহনের পূর্ব্বেই রচিত হয়। হরনাথ ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বেই সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষার বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করেন। * * কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাকেই আদি গদ্য লেখক বলিতে অসন্তুষ্ট নহি ; কেন না তাঁহার পূর্ব্ব সাময়িক গদ্য গ্রন্থ সকল এতাদৃশ জঘন্য ভাষায় লিখিত যে, রামমোহনকেই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"

এই স্থলে চণ্ডীদাস রচিত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' নামক একটী ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তকের প্রারম্ভ বাক্য নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল : "চৈতন্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি র এতে চ মিশাল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি। রাগ রতি। লাড়ির নাম সুধা। সেই লাড়ি সাতইস প্রকার।"

অধুনা সহজিয়া সম্প্রদায়ের বহুবৈষ্ণব কবি রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে ; কোন কোন বৈষ্ণব কবি স্বরচিত পদাবলীর

মধ্যে মধ্যে গদ্য রচনা বিন্যস্ত করিয়াছেন ; তন্মধ্যে কয়েকটী নীম্নে উল্লেখ করিলাম :

(১) রূপ-গোস্বামীর কারিকা [১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে রূপগোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন]

(২) কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাগময়ী কণা

(৩) আত্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

(৪) কৃষ্ণদাস রচিত আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সারাৎসার

(৫) নরোত্তম দাসের রাজমালা

(৬) বৃন্দাবন পরিক্রমা [ইহার রচনার নমুনা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে ; অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ইহার পুথির নকল লিখিত হয়]

ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত—

সম্প্রতি ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "It has been in existence as an independent and characterised language, or rather, as a distinct dialect group, for nearly ten centuries." আরও অন্যত্র লিখিয়াছেন "By the middle of the tenth century, to which period the earliest extant specimens of Bengali can be referred, the Bengali language may be said to have become distinctive, as the expr ssion of the life and religious aspirations of the people of Bengal, with the nucleus of a literature uniting the various dialectal areas. * * Maithili, Bengali and Oriya are by 1300 A. C. fully developed languages each with

its own characteristics, and not mere dialects of a common Magadhi."

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মত—

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিদিগের ভাষা, অর্থাৎ ব্রজবুলি বা মৈথিল বা প্রাকৃত ভাষা (সংস্কৃত নাটকাদির প্রাকৃত ভাষা নহে —তবে তাহারও সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে) বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার আদিম অবস্থার জিনিষ। দীনেশবাবুর মতে বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বকালে প্রাকৃত ভাষা নামেই পরিচিত ছিল। তিনি আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "নাগরী অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন। বঙ্গলিপির রূপ অনেকটা চন্দ্রবর্ম্মার লিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই লিপিই ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"* আবার এক স্থলে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "Some * * hold that Raja Rammohun Ray started the Bengali Prose. Others say that it was 'Alaler Gharer Dulal' which first showed the example of writing in colloquial style * * Bankim chandra seemed to favour the current belief in the Introduction to Tek chand Thakur's work in 1892 'It is generally believed that Bengali Prose owed its origin to Raja Ram Mohon Ray.' *Recent researches have made it clear that Bengali prose was extant even in the tenth century A. D.

* দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, ১১ পৃষ্ঠা

[In the Suunya Purana] there are some passages at least, which savour of the style of a very distant epoch of our literature. In the fourteenth century Chandidasa wrote a short treatise in prose expounding the truths of the Sahajia cult in a language which has been recently termed by some seholars Sandhya Bhasa. * * We have found a very old translation of the 'Bhasa Parichhad' written about [the end of the eighteenth century]. * * * It must however be admitted that prose was not the general medium in those days. The development of Bengali prose is certainly due to the English [who wrote] many instructive treatises on a variety of subjects in our language. * * It was neither Tekchand Thakur nor Raja Rammohan Ray who originally set forth the models adopted in their works."—Bengali Prose Style from 1800 to 1857.

প্রাচীন বাঙ্গালা ন্যায় শাস্ত্র

দীনেশ বাবু যে ভাষা পরিচ্ছেদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন উহা ন্যায়-শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ। ন্যায় শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। ইহার ভাষার নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল : গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়? তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর

করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়! তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, পদার্থ কহো? তাহাতে গৌতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।" ইত্যাদি।

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'কীর্ত্তিলীলা' নামক একখানি পদ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাধাবল্লভ শর্ম্মানামে জনৈক ব্যক্তি পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় হিন্দু আইনের পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষের মত—

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ বলেন—"আকবর সাহের রাজ্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই বঙ্গীয় ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভাষাটী নিতান্ত সামান্য দিনের নহে। আমরা প্রমাণ করিব প্রায় সাতশ তবৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাভাষা চলিয়া আসিতেছে। * * *

কোমল ভাব প্রকাশের জন্য কোমল ভাষার প্রয়োজন। বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় কোমল ভাব অভিব্যক্তির ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। * * জয়দেবের সময় বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত শিশু বালিকা নহে, তখন ইহা আকারে পরিপুষ্টা হইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই, গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ হইলেও, ইহার ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত নহে—ইহার ভাষা বাঙ্গালা সংস্কৃত; ইহাতে সংস্কৃতের মাধুর্য্য ও বাঙ্গালার লালিত্য উভয়ই আছে। * * জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা প্রথমাবস্থা। * * আকার গত সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে আমরা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতেরই কন্যা বলিতে বাধ্য হইব; বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা, প্রাকৃতের

নহে; তবে সংস্কৃতের যৌবন অবস্থার কন্যা নহে, বৃদ্ধ বয়সের কন্যা। * * বাঙ্গালা প্রাকৃত ভাষার কনিষ্ঠা ভগ্নী। * *

প্রাকৃত ইহার প্রতিপালিকা বলিয়া মান্য পাইতে পারে—মাতৃ সদৃশী আখ্যা পাইতে পারে—মাতৃস্থানীয়াও হইতে পারে; কিন্তু মাতা হইতে পারে না। * *

বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি ইহা জয়দেবের পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। জয়দেবের সময় ইহার কুমারী অবস্থা। জয়দেব সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষারই প্রথম কবি: ভেনারেবল বিড সাহেব যেরূপ লাটিনে গ্রন্থ লিখিলেও ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য পাইয়াছেন; আমাদের জয়দেব ও সেইরূপ। * জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি। * * * জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ও বাঙ্গালা ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। * * বঙ্গভাষা সপ্তম শতাব্দী হইতে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়াছে; বিদ্যাপতির সময় ভাষার অনেকটা বলাধান হইয়াছে। *

যে সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আপনাদের প্রভায় বঙ্গভূমি আলোকিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডীয় প্রথম কবি জিয়োফ্রি চসর (Geolfrey Chaucer) তাঁহার কাণ্টরবেরি (Canterbury Tales) কাব্য লিখিয়া ইংলণ্ড মাতাইতে ছিলেন ও ইংরাজি সাহিত্যের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছিলেন। যে সময়ে ইংরাজী সাহিত্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, প্রায় সেই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি।"

কুমুদনাথ দাসের মত—

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস তাঁহার 'History of Bengali Literature' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "Our mother tongue originated

more than a thousand years ago from an old type of Magadhi Prakrit, which was related to Sanskrit in much the same way as Italian to Latin, characteristically avoiding conjunct consonants and preferring final vowels.

Though Bengali is an offshoot of Magadhi Prakrit, yet the influence of the Persian and Arabic languages upon its growth cannot be ignored. During the Muhammadan rule many Persian and Arabic words naturally crept and formed part and parcel of our language. As instances in point the following words may be cited—Ain (law), Doat (ink pot), kalam (pen), kagaj (paper) * *

As a consequence of the British suzerainty in India for more than a century and a half, many English words have passed into and become naturalized in our language. * *

বঙ্গাক্ষর সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত—

'A cursory examination of the Bengali alphabet will convince our readers that it is derived and simplified from the Devanagri alphabet. This modification was made many centuries ago and all that exists of Bengali literature from the time of Chandidasa and Kasiram

was recorded in this modern Bengali alphabet.' (R. C. Dutt's. Literature of Bengal). * *

Shunya Puran by Ramai Pandit, the songs of Manik chand, the songs of Gobinda chandra and epigrams of Dak and Khana' are other early poems in our language —composed between 800 to 1000 A. D. An under-current of Buddhist ideas and tendencies runs through them and they throw a flood of light upon the quaint manners and customs among our forefathers more than a thousand yesrs ago."

কেদারনাথ মজুমদারের মত—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার স্বপ্রণীত গদ্যসাহিত্য নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "বোধ হয় বাঙ্গালা লিপিমালা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গদ্য রচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। * * বাঙ্গালা গদ্য রচন অতি প্রাচীন হইলেও ইহার প্রাচীনতার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল।" কারণ বাঙ্গালায় আদিম অবস্থার রচনা বেশীর ভাগই কবিতায় কিম্বা গানে। এই জন্যই শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস বলিয়াছেন "প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গদ্য নহে, পদ্য"। *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও বলিয়াছেন: "The prevailing form was verse, not prose, in old and mediæval Bengali" † আরও, "Poetry was the only

* বাংলা সাহিত্যে ভাষাবিভ্রাট—বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৪১

† Western Influence in Bengali Literature (p. 14)

style to which authors applied themselves, and studied prose was utterly unknown. Letters of businerss, petitions, public notifications, and all such other concerns of common life are necessarily, and of course, written without measure or rhythm. I might almost have added, without Grammar. But all the compilations dedicated to Religion, to History, to Morality, and all such works as are expected or intendied to survive the composer, are invariably written in verse" ‡

পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা রচনা বেশীর ভাগই পদ্যে—

পদ্য দেখে ভাষার অবস্থা ভাল রকম বিচার করা যায় না, কারণ পদ্যে যে সব কথা ব্যবহৃত হয়, সাধারণ কথোপকথনে বা গদ্য রচনায় লোকে তাহার অনেক কথা প্রায় ব্যবহার করে না। কাজেই কোন ভাষার বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিতে হইলে পদ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া গদ্য গ্রন্থের দিকেই দৃষ্টিপাত করা বেশী দরকার। "ভাষার প্রতি দেশবাসী লোকদিগের যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গদ্য গ্রন্থে লোকের অনুরাগ জন্মে [বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে] তাহার কিছুই হয় নাই—হইলে ঐ কালের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন না কোন ব্যাকরণ রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা অভিধানও

‡ Western Influence in Bengali Literature (pp. 287-88).

এ কালের মধ্যে রচিত হয় নাই।" বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ সিবিলিয়ান হালহেড সাহেব কর্ত্তৃক ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে পরে আরও সবিস্তারে বলিব।

"সে সময়ে পুস্তকাদি অতি দুরূহ সুসংস্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত হইত। এবং কথিত ভাষা প্রায় বর্ত্তমান কালের গ্রাম্য ভাষাপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল, সুতরাং তৎকালে বঙ্গসাহিত্য অতি নীরস ও শ্রীহীন ছিল। বঙ্গসাহিত্যের এই প্রকার দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত ইহা অনেকেরই আয়ত্তগম্য ছিল না।" *

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বলিয়াছেন; "Examples of the earliest prose writings in our literature are to be traced so far back as the 9th or 10th century A.D. Ramai Pandit's poem Shunya Puran written about 1000 years ago * * * furnishes a very peculiar specimen of Prose. Poet Chandidasa's Chaityarupa Prapti written about 600 years ago and such works as Ragamayi kana and Karika by Sahajiya Vaishnava authors provide examples of later prose, one chief feature whereof is the almost total absence of verbs in sentences as will appear from the following lines of Karika প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণনির্ণয় ইত্যাদি— ইতিপূর্ব্বে ৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন বসু সহজিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্ব সমেত যে ৭৯

* বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী—যতীন্দ্রনাথ বসু

খানি পুস্তকের নামোল্লেখ সহ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে ১৪ খানি গদ্যে রচিত এবং অবশিষ্টগুলি সবই পদ্যে।

রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ—

কুমুদ বাবু যে শূন্যপুরাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অন্যূন ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা। পুথি নকল হইতে হইতে ইহাতে পরবর্ত্তী কালের কিছু কিছু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ইহার একটী সংস্করণ প্রথমে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বসুমতী-সাহিত্য মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় আর একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শূন্য পুরাণের রচনার নমুনা যথা: "কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দি জল বার ভাই বার আদিত্ত। হখপাতি লহ সেবকর অর্ঘ-পুষ্প পানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎকাম্নি। গুরুপণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্নাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখমুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।" ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই

এই শূন্য পুরাণের আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম: পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই যে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা॥ চন্দ্র কোটাল যে বসুয়া ঘটদাসী। দুত নাহি ডরাই তুম্মাকে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাজি পরিমান কর এ দুত জমর বিগুমানে॥ দীনেশবাবু ইহার নীম্নলিখিত ইংরেজি অনুবাদ দিয়াছেন: who is the scholar

in the Western gate? Swetai with 400 followers. Chandra the police officer···the messenger is not afraid of thee Chitra Gupta keeps a register.

শূন্য পুরাণ প্রণেতা এই রমাই পণ্ডিত গৌড়ের অধীশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে রমাই পণ্ডিত বাঁকুড়া জেলায় দ্বারকেশ্বর তটে চম্পাই ঘাটে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের আদিম অবস্থা বর্ণনা কালে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন; "বাঙ্গালা গদ্যের জড়তা মুক্তি খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগের পূর্ব্বে হয় নাই। ষোড়শ শতকে উহার রূপ কি রকম ছিল তাহা অনুমান করিতেও ভয় হয়। * * তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠি পত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে।" সুকুমার বাবু ১৫১৫ সালে লিখিত একখানি পত্রের নমুনা দিয়াছেন। "কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই পত্রটী আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে লেখেন। * * * পত্রের মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের একখানা পত্রের নমুনা ঃ—

* * * লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক।

† বঙ্গশ্রী,—১৩৪০, বৈশাখ।

আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় (,) না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা। * * * ” উক্ত সুকুমার বাবু ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের একখানি পুরাতন দলিলেরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ;

১৭১৭ খৃষ্টাব্দের একখানা দদিল :—

“ * * * আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন * * * ”

১৬৩১ খৃষ্টাব্দের একখানা পত্রের নমুনা :—

এই স্থলে ১৫৫৩ শকে আসামের রাজা কর্ত্তৃক গৌহাটীর মুসলমান ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে লিখিত একখানি পত্রের নমুনাও প্রদর্শিত হইল ; “স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্যপরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব-আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচারপত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্রসহ আসিয়া আমার স্থানে পঁহুছিল। আমিও প্রীতি প্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ

মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয় ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক। আর তোমার আমার অত্যন্তরূপে আনন্দযুক্ত হইলে উভয় পক্ষ লোকের নাবিদ্বেশরূপ অবিযুতা অন্তশেত কিসক না রহিবেক। এ কারণ তুমি লিখিবাক পোরা।

পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের নমুনা খুঁজিতে গেলে রাম বাম বসু রচিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১ খৃঃ) লিপিমালা (১৮০২ খৃঃ) প্রভৃতি পুস্তককে প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্য রচনা বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু অধুনা শিবরতন মিত্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরও অনেক আগেকার গদ্য রচনা যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেনও তাঁহার 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকের নবম অধ্যায়ে অনেক পুরাতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন ও তাঁহার বঙ্গসাহিত্য পরিচয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক পুরাতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার নমুনাও দিয়াছেন। আমরা সেই সকল প্রাচীন গদ্য রচনা নমুনা স্বরূপ মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত দু একটী উদ্ধৃত করিব।

বাঙ্গালা ভাষায় রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ ও চণ্ডীদাসের চৈত্যরূপ প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রাচীন গদ্যগ্রন্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। রচনার পারিপাট্য হিসাবে এই দুইখানি পুস্তক উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য না হইলেও প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট এই পুস্তকগুলি বড় মূল্যবান— সন্দেহ নাই। এই পুস্তকগুলির রচনা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে সময়ে এই পুস্তকগুলি রচিত হইয়াছিল বাঙ্গালা গদ্যের আকার

তখনও পূর্ণরূপে গঠিত হয় নাই। অধিকাংশ বাক্যগুলিতেই ক্রিয়াপদের অভাব এবং বেশীর ভাগ বাক্যে তিন চারিটীর অধিক শব্দ নাই;—ইহাই এই সময়কার রচনার বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্যসমূহ তখনও বাঙ্গালা গদ্যে ব্যবহৃত হইতে সুরু হয় নাই। ইহাতেই মনে হয় এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যের প্রকৃত প্রাচীনতম অবস্থার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় যুগ

দ্বিতীয় যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ—

এইবার আমরা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের বিষয় অনুশীলন করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ বাঙ্গালার সহিত যাবনিক শব্দের অবাধ সংমিশ্রণ—কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি গানে, কি পত্রাদিতে, কি দলিলাদিতে। তবে দলিলাদিতে আরবী পার্সী শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য আজও বজায় আছে।

সে সময়ে দলিলাদির জন্য কিংবা রাজদরবারে যে বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহৃত হইত তাহা কেবল আরবী পার্সী আর সংস্কৃতের সংমিশ্রণ মাত্র।

শিবরতন মিত্র মহাশয়ের Types of Early Bengali Prose নামক পুস্তকে ইংরেজী আমলের পূর্ব্বেকার বহু দলিল দস্তাবেজ ও পত্রাদির নমুনা লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহার কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল :

"নকল সনদ বমহর রাজা আসদুল্লা খাঁ সাহেব—সন ১১১৩ সাল তাঃ—৮ মাঘ

হুকুম শ্রীযুত দেওান সাহেব জী—

ইজ্জত আসার বৈকুণ্ঠরাম দত্ত সিকদার ও মধুসূদন সর্ম্মা কারকুন সুচরিতেষু আগে তরফ খএরাত সেখ আবদুল্লার ও সেখ আবদুল মোমেন সাং দুর্গাপুর আরজ হইলা জাহির করিলেন জে পরগণা খটঙ্গা দুর্গাপুরে

খএয়াত জমি সালি ১০ দষ বিঘা পাই ভোগ করিতেছি সনন্দ রাখি এখন নীকদার সনন্দ তলব করে জে হুকুম হয় তাহার আরজ যুনিঞা হুকুম করিল সনন্দ তহকীব করহ জদি মো' সনন্দ ভোগ প্রমান খএরাত মনযুর রাখিল সনন্দ করিয়া দেহ অতএব সনন্দ তহকীব করা গেল সনন্দ সন ১১০৩ সাল ২১ অগ্রান ৮০ দাগে অজবঞ্জর সালি মাঠ জমা খারিজ হুজুরের মুহর্ব্বে জাহিব করিলেক অতএব মোং পূর্ব্ব সোনন্দ ভোগ প্রমান খএরাত মনযুর রাখিল মোং কীং পঞ্চানন রায় বকসী জাএ মোং খএরাত ছাড়িয়া দিহ তপসীল জএন

মৌফীক পরওানা জমা দষ বিঘা জমা আট তঙ্কা নএ আনা সাড়ে ভোগ প্রমান ছাড়িঞা দিহ ইতি ৮ মাঘ ১১১৩ শন।”

দাস দাসী বিক্রয়ের দলিল

৭ই ইয়াদিফীর্দ্দ শ্রীশঙ্কর দাস উলদে রুদ্রদাস সাকীম পরগণে বেজোড়া সদাসয়েষু লিখিতং শ্রীবোদাইর স্ত্রী সাকিম বেঙ্গাডুবা পরগণে মজকুরে কস্য মুনিস্য আজীরি পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে—আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে রে আজি তিন রুপায়া লৈয়া আমার বেটী যার উমর এগার বরিস তুমার স্থানে আফির খাস করিয়া দিলাম। লআজীমা খুরাক পোষাগ খাইয়া পীন্দিয়া মুর্দ্দত সর্ত্তের বরস খেদ মত আবকসী ওমাহর করিব। যদি এই মুর্দ্দতের মৈদ্ধে ফারগ হৈবার চাহে তবে দশ মণ তামা আরিব দিআ আখাগস হইব। দান বিক্রয় অধিকার দাসী তুমার আমার কিছু এলেকা নাই এতদর্থে আজীরি পাট্টা লেখিয়া দীলাম ইতি সন ১১২৫ সাল তাদববিথ ২০ রাম্না মাহে ৬ই চৈত্র শ্রীবোদাইর স্ত্রী ও শ্রীমতী কনাই।

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

চরণ শ্বরণং

ইআদিফীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয়

শ্রীমতী কোমলমুনী কল্যানীয়াবরেষু

শ্রীরামভদ্র দেবশর্ম্মন
সাকিন বাগুটী

লিখিতং শ্রীরামভদ্র দেবশর্ম্মন দানত্তর পত্রমিদং

লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে আমার সন্তান রহিত তুমি কন্যা আর কেহ ক্রীয়াআদী আমার করে এ মত নাই এককক্ষন। ক্রীআত্তা তুমী একারণ আপন সেৎসা পুর্ব্বক আপন ভদ্রাশন ও জমী ও পুস্কনি সাকিম তপশীল মবলগে ৫৮/ আঠার্ম্ব বিঘা ব্রক্ষত্তর পৈত্রীক ও শোপাজ্জীত ও সিস্ত সেবক জেখানে জে আছে তাহা সমস্ত নেত্তকিত্তী তোমাকে দিলাম জেতক জীবিত থাকীব তদবধী আমার ও আমার স্ত্রির শেবা যুছশাআদি করিতেছ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম জথাজোগ্‌গ করাইবা আস্তষ্ট ক্রীয়াআদী করিয়া সাকিম তপসীল জমী আবাদ তবহুদ্‌ করিয়া ও সিস্ত সেবক বহাল রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম যুখে ভোগ করিয়া ইহার দান বিক্রয়ের সত্তধিকার তোমার আমী কীম্বা আর কেহ দাত্তা করে শে ঝুটা ও বাত্তিল এতদর্থে দানত্তর পত্র দিল ইতি সন ১১৬৩ এগার সত্ত তিষট্টী সাল তারিখ ১৭ই মাঘ।

তপসীল—

(জমীর বিবরণ—)

৫৮/

মবলগে আঠার বিঘা

মদনেশ্বর শিব
ঠাকুরের

পরগণে সরূপ সিংহের ইজার্দ্দার ও সিবিস্তদোর...বাজে জমির তহসিলদার প্রতি বেদানন্দ আগে মৌজে কোটাষুরের শ্রীমহাদেব সর্ম্মা ও শ্রীশিবু শর্ম্মা (ছেঁড়া)...পরগণা মজকুরের মোজে কুসটিকুরি (ছেড়া) ...পূর্ব্ব ও সনকপুরদিগের ৺দেবত্তর (ছেড়া)...বিঘা সাবিক গোড়া (গোণ্ডা)খারিজ মুহুব্বাই আছে তাহার ফসল সবে চাকলা কোরক হইয়াছে অতএব দপ্তর তকরার করা গেল ইহার ৺দেবত্তর গোণ্ডা (গোড়) খারিজ মুহুব্বাই বহাল আছে আমল জামুল ভোগ প্রমাণ দেবত্তর জমির ফসল জায়মত ছাড়িয়া দীবে আটক না করিবে ইতি সন ১১৯৯ সাল তারিখ ১৭ই সতরই পৌষ

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরাধাবিনোদ সিংহ সচ্চরিতেষু

লিখনং কার্য্যঞ্চাগে মৌজে টিকরবেতা পরগণে সেনপাহাড়ি সামিল তরফ মন্ত্রেস্বর মৌজে মজকুরে গ্রামের ইসান ভূঞার পুষ্করিণীর উত্তর রাস্তা ও সাধুর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব রাউতলা ও বুড়ির পুষ্করিণীর

পারশী লেখির
জমী দাম বেওয়ারিষ
পুষ্করী ছয় বিঘা
বার কাঠা তাহা

পশ্চিম কিসমত গুরুপ্রসাদ ঘোষ ও কিসমত কৃপারাম ঘোষ রাইয়তি ও খামার ও বাজে জমী দরুণ গুরুপ্রসাদ ঘোষ দিগর মাফিক তফশীল সালিজমি ৫৴২ পাচ বিঘা দুই কাঠা আর ইহার উত্তর ও পশ্চিম বেওয়ারিষ খামার দরুণ:কয়রা গড্যা মায় পাহাড় ১৷৹ এক বিঘাদশ কাঠা একুনে জমি ৬৷৷২ ছয় বিঘা বার কাঠা তোমায় দরখাস্ত মতে পুষ্করিণী

খাত কারণ দেয়া গেল মাফিক তপশীল চকনামা জমি চিহ্নিত করিয়া লইয়া পুষ্করিণী খাত করিয়া শ্রীশ্রী৺কে অর্পণ করিয়া জলে মৎস্য জিলাইয়া পাহাড়ে বৃক্ষাদি রোপন করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ কর ইহার রাজস্ব সহিত দায় নাই ইতি সন ১১৯৯ এগার সত্ত নিরানব্যই সাল তারিখ ৭সাতঞী চৈত্রী। জমীর জায়—

মহামহিম শ্রীমুরসিদাবাদের শ্রীযুত ক্লেকটর সাহেব

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীলালমোহন সিংহ

মুচলিকা পত্রমিদং সন ১২০১সাল

লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে আমার তালুক তরফ শ্রীকণ্ঠপুর দিগর পঞ্চসালা রেজষ্টরী করাই তাহার কারণ তাহার রকবাবন্দী কাগজ আমী দখলে করিলাম কাগজ মজকুরে জমী ও

শ্রীলালমোহন সিংহ

দঃ শ্রীপঞ্চানন সিংহ

হস্তবুদ জে লিখিয়া ছিলাম জদি কোন দফা ছাট ও তকরর করিয়াছি এমত প্রমাণ হয় তবে সদর ইতলাতে আমার জে জরিমানা হইবেক তাহা দিব এবং এতদর্থে মুচলিকা পত্র দিল ইতি

আত্ম বিক্রয় পত্র

ইয়াদী কীর্দ্দি সকল মঙ্গলালয়

শ্রীলালা গুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবি পত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে

মরি মহাশয়ের নিকট আত্ম বিক্রয় হইলাম ভরণ পোষণ করিয়া দাস্তে দাখিল করিবেন। একরার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটাবি পত্র দিলাম। ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক ১৪ই ভাদ্র

শ্রীচারু বেওয়া সাং ঘরুতা

[১২১০ সাল]

সম্প্রতি তারকেশ্বরের মোহন্তর প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের Paper Boo..এ কয়েকখানি অতি প্রাচীন দলিলের ও আদালতের বিচারক কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় প্রদত্ত রায়ের অনুলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সন ৭৮৫ সালের রাজা ভারামল্লের ছাড়পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ইহা অপেক্ষা প্রাচীন দলিলের নকল আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই—

রাজা ভারামল্লের ছাড়পত্র (সন ৭৮৫ সাল)—

৺শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী সাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি

নাগরী সহি শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়

শালীশুনা হর্দ্দ মহদুদ ঘোড় দৌড় জতজোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধূম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

উক্ত Paper Book হইতে ১৭৯১খৃষ্টাব্দের আদালতের Judgment

এর নকলও নিম্নে প্রদর্শিত হইল ; ইহা হইতে জানা যায় যে তখন judgmentও বাঙ্গালায় দেওয়া হইত :—

Judgment in Parasuram Giri V. Fate Giri and others (passed on 6th may, 1791)—

"ফরিয়াদী আর্জ্জী দেয় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরে স্থানের আমার তিন পুরুষ ক্রমাগত ঐস্থানে মোহন্তগিরি করিয়া আসিতেছেম আমায় গুরু ৺প্রসাদ গিরি মোহন্ত বর্ত্তমান থাকিতে আমিহ তির্থ জাত্রায় গিয়াছিলাম —সন ১১৯২ সালে মাহ আশাড় আমার গুরুজিউয়ের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে আমার না থাকাতে আমার খুড়া জগন্নাথ গিরি গ্যোঞীকে [গোসাঞীকে ?] ডাকাইয়া মাল আমাল ও কাগজপত্র সেবা সদাব্রত ও মোহন্তগিরি আমার কারণ সরফর্দ্দ করিয়া তাহার পরলোক হইল জগন্নাথ গিরি গোসাঞী সেইরূপ চালাইতেছিলেন। ঐ সন মাহ আশ্বীনে গতিয়া (গেতি) ভাই একালা ফতেগিরি রাজবাটীতে খেলাপ নালিশ করিয়া মোহন্তগিরি দখল করিতে গিয়া অনেক তছরূপ করিতে জগন্নাথ গিরি হুজুর জাহির করিতে ফতেগিরির মোহন্তী দখল বাতিল হইল জগন্নাথগিরি মোহন্তাতে বহাল রহিল সন ১১৯৫ সালে মাহ পৌষে আমী তির্থ হইয়া আসিয়া ৺স্থানে পৌছিতে জগন্নাথগিরি গোসাঞী মোহন্তীর বিশয় আমায় জেম্মা করিয়া দিলেন আমীহ মোহন্তগিরিতে সকল কার্য্য ভার লইয়া ৺জিয়ের সেবাতে নিযুক্ত রহিলাম সন ১১৯৬ সালে মাহ কার্ত্তিকে আমী ৺গঙ্গাস্নান যাইতে মফস্বল ফতেগিরি খানখা কারসাজী করিয়া থানাদারকে হামরায় (দলবদ্ধ) লইয়া আমার গোমস্তার স্থানে কাগজ ছেনাইয়া লইয়াছে আমী* * *

উক্ত Paper Bookএ মুদ্রিত ২৭শে আষাঢ়, সন ১২২১ সালের মোহনগিরির আমলনামার অনুলিপির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ইয়াদি ফির্দ্দি শ্রীমোহনগিরি মোহন্ত সুচরিতেষু—

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে তরফ ভাণ্ডারহাটী ওগায়েরহের মহল (কাটা) দিগরের মধ্যে বালিগরী পরগণার সেট গুরীয়া ২ দুই মৌজা মহলাতের কাত জমা শালিয়ানা মালগুজারী ৯৭৮৷৷৹টাকা মহলের ৫ শত টাকা পনে তোমাকে মফস্বলি পত্তন তালুকদারী পত্তন করিয়া পনের টাকা বেবাক পাইলাম তুমি মারীফ তফশীল জএন মহালৎ মজকুর আমল মামল মাফিক জামিন মাল আমার ও চাকরাণ হাসিল ও পতিত ও জঙ্গল ও জলকর ও বনকর ও বাগাত ও ফল ও পুষ্করিণী ও বিল ও ঝিল হকুক জমিদারী যে আছে তাহা দখল করিবে সরকারী খাশ বাগান ও হাবেলী পুষ্করিণী যে সকল সরকারের খাশ দখলে (কাটা) সহিত এলাকা নাই, মাল গুজারীর টাকা সিক্কা সহি মাস ২ কিস্তী ২ (কাটা) ভাণ্ডারহাটী ও গায়রহের কাছারীর বরাবর সরবরাহ করিবে কোন মতে খারিজ হইতে পারিবে না। * * *"

উক্ত Paper Book হইতে মোহন্ত রঘুনাথ গিরির অনুকূলে মোহন গিরি কর্ত্তৃক ২রা আশ্বিন সন ১২৪৯ সালে লিখিত নিয়ম পত্রের অনুলিপি হইতে কিয়দংশ নীম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"লিখিতং শ্রীমোহনগিরি মোহন্ত রাজা

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়—

শ্রীযুক্ত রঘুচন্দ্রগিরি কল্যাণবরেষু

কস্য মালিকত্ব নিয়মপত্র মিদং সন ১২৪৯ সাল অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে বালিগড়ি পরগণায় জ্যোৎশম্ভু গ্রামে ৺তারকেশ্বর শিব-

ঠাকুরের গদীনশিন মোহন্তীতে আমি কায়েম থাকিয়া ৺গুরু ও পরম-গুরু আমলের সকর ও নিষ্কর ভূম্যাদি ও আসবাব ইত্যাদি ভোগ দখল ও ৺সেবা ও অতিথিসেবা আদি করিয়া আসিতেছি এবং স্বয়ং নিজনামে আমার বহু পরিশ্রমে স্বোপার্জ্জিত দৌলত দ্বারা পত্তনী তালুক আদি যাহা করিয়াছি ও আসবাব আদি যাহা মজদ আছে ও স্বোপার্জ্জিত খাতকান সকল স্থানে যে সকল পাওনা আছে আমার প্রাচীন অবস্থায় শরীরে ভদ্রাভদ্রের কথা বলা যায় না—পূর্ব্বে যে সকল চেলা মুণ্ডন করিয়াছিলাম তাহারা কতক স্বর্গে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইয়াছে * * * এতদরে রীতিমত খোরপোষ পাইবে। এমতে সম্যক বিষয়ের মালিক ও গদিনাশন তোমাকে করিয়া নিয়মপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৪৯ সাল তাং ২রা আশ্বিন।

ইসাদি—* * * *”

চৈতন্য সম্প্রদায়ের বাঙ্গালা রচনা—

পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—“চৈতন্যদেব ১৪০৭ বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। * * চৈতন্যচন্দ্রের কিছুদিন পরেই বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। * * বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত কিছু সরল ও বিশদ; কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত কিছু কঠিন ও জটিল; কিন্তু এ দুয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। রূপগোস্বামীর রিপুদমন বিষয়ে ‘রাগময়কণ’ নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিতে পাই। সনাতন গোস্বামীর ‘রসময় কলিকা’ ও শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর ‘করচাই’ বাঙ্গালায় রচিত। [এতদ্ব্যতীত ইহাদের সংস্কৃত গ্রন্থ অনেক ছিল] * * * চৈতন্যদেব

নিজে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন; তাহারই ফল রাগময়কণ, রসময় কলিকা, করচাই, চৈতন্যভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচন দাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি। তবে এ সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বলাধান হয় নাই। স্ফুর্ত্তিযুক্ত হইলেও যেন তেজহীন।"

বৈষ্ণব কবিদিগের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য—

এইখানে আর একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। উপরে মাত্র কয়েকজন বৈষ্ণব কবির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে আদিম অবস্থায় এই বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির জন্য বৈষ্ণব কবিরাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন:—"বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ যে বঙ্গভাষার অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহাদের যত্নবারি সিঞ্চিত না হইলে বঙ্গসাহিত্য অকালেই লয়প্রাপ্ত হইত; ইহা জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-কবিগণেরই অঙ্কে লালিত ও পালিত হইয়াছে; * * আমরা যে এক্ষণে আমাদের নিজের ভাষায় সকল প্রকার কথোপকথন করিতে পারিতেছি ইহা তাঁহাদেরই অনুগ্রহে, না হইলে আমাদের মাতৃভাষায় আমরা এক্ষণেও সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কি না, কে বলিতে পারে? * * সাধারণ লোকে তখন পারসী ভাষারই প্রতি অনুরক্ত ছিল; পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন; সুতরাং সে সময়ে কেবল বৈষ্ণব কবিগণই ইহার উপর সদয় ছিলেন—এবং তাঁহাদের এই সদয় ব্যবহারের জন্যই বাঙ্গালা ভাষা আজও জীবিতা রহিয়াছে ও দৈনন্দিন ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল করিতেছে।"

উক্ত চৈতন্য যুগের রচনার মধ্যে রূপগোস্বামীর 'কারিকা' ও 'রাগময়ী কণা,' সনাতন গোস্বামীর 'রসময় কলিকা,' নরোত্তম ঠাকুরের 'আশ্রয় নির্ণয়' ও 'দেহ কড়চা,' বৃন্দাবন দাসের 'গোলক সংহিতা,' জীব-গোস্বামীর 'করচাই,' কৃষ্ণদাসের 'আত্মজিজ্ঞাসা,' 'আত্মনিরূপণ,' 'স্বরূপ বর্ণন', ত্রিগুণাত্মিকা,' 'ব্রজপটল কারিকা', 'ক্রিয়ামঞ্জরী,' 'তত্ত্ব নিরূপণ', 'জিজ্ঞাসা পত্রী', 'সহজ তত্ত্ব' বা 'ভক্তি চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এ পুস্তকগুলির অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর ধরণে রচিত। বলা বাহুল্য, এ পুস্তকগুলিতেও রচনা পারিপাট্য কিছুই নাই; অলঙ্কার বা শব্দাড়ম্বরও কিছুই নাই। তবে এ পুস্তকগুলির ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতস্তরের এই হিসাবে যে এ পুস্তকগুলির প্রত্যেকটী সারগর্ভ ও উপদেশ মূলক। ক্রমবিকাশ রীত্যনুসারে এই পুস্তকগুলির রচনা আদিযুগের রচনা অপেক্ষা একটু ভাল, একটু উন্নত বলা যাইতে পারে। দীনেশবাবু তাঁহার ইংরেজিতে লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে এই সহজিয়া সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকের একটী সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; তাহার মধ্যে অনেক গুলিতেই গদ্য রচনা আছে এবং তাহার অধিকাংশই চারশত বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা।

রাগময়ী কণা—

পূর্ব্বোক্ত শিব রতন মিত্র মহাশয় এই "রাগময়ী কণার" রচনার নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন; তিনি যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে লেখক, লিপিকাল বা রচয়িতার নাম পান নাই। এই রচনার কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল; "অথ গোস্বামীদিগ্যের উপাসনা॥ ৩॥ তিন মত তাহার বিবরণ॥ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ॥ রাগে কহি উপাসনা সিদ্ধের লক্ষণ॥ উপাসনা হয় য়েক কৃষ্ণের মনন॥ শ্রীকৃষ্ণের মন কি তিন য়ক্ষর হয়।

রাধিকার স্মরণ কি। না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধেকৃষ্ণ॥ লিলা কিঃ কৃষ্ণ লিলাঃ গউর লিলাঃ নিত্যানন্দ লিলাঃ রূপ কি॥ শ্রীমতি রাধিকা জিয়ের রূপ। সে কেমন॥ না সর্ন্নবর্ণ॥ সর্ণকান্তি। আর কৌমারি॥ বয়েষ কাঞ্চনঃ পাঞ্চালিকাঃ গুণরসঃ তুইজনের বয়েস পঞ্চদশ॥ য়ক্ষরের সেষ নানা বর্ণ ধরে সেই মধ্যম য়ক্ষর॥ বিজ য়ক্ষর কিঃ শ্রী৺ মুলা রূপ কিঃ যার সোন গতি কিঃ অনুরাগঃ মানস কিঃ না দশা কোন দশা রাগদশাঃ বয়শ কি না চদ্যবৎসর॥ আঠার দিন॥ পান কি না হরিনাম॥ ধারণ সিঞ্চন কিঃ প্রেমনির॥ ধাম কোথা রাধাকুণ্ডে॥ য়াসন কি না নিত্য বসন॥ ছন্দ কি না গায়ত্রি॥ হৃিসিকেশঃ স্থান কোথা? সরোবরে॥ কোন সরোবরঃ রাধাকুণ্ডুঃ পিবন্তঃ কৃষ্ণ তার য়তি অনুপাপঃ রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে॥ কৃষ্ণের আক্ষান। কৃষ্ণের বাহিরে য়াছে।

উপাসনা॥ উপাসনার নাম কি। যুগল মন্ত্রঃ পঞ্চনাম॥ রাধিক্যার স্বরূপ কি॥ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি॥ অনুগা কি॥ ধর্য্য কিঃ কি রস মাধুর্য্য উপাসনা কি॥ কাম গায়ত্রী কারে বলি॥ শ্রীকৃষ্ণ কামবিজ শ্রীরাধিকার সত নাম মাধুর্য্যে গুণ তিন য়ক্ষর॥ মাধুর্য্যের গুণ শ্রীমতি * * * সে সকল কথার বিবরণ॥ কেবল রাগ দশ। শ্রীরূপ মঞ্জরী শ্রীরাধিকার বস্তধারি। শ্রীরূপ সনাতন রাধিকার অংশ। তিন জন এক বটেন॥ রসের সমতা॥"

ইহার পাদটীকায় শিব রতন বাবু লিখিয়াছেনঃ 'শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত রাগময়ী কণা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল'।

শিবরতন বাবুর পূর্ব্বোক্ত পুস্তক হইতে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় রচিত বাঙ্গালা গদ্যের আরও কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

রস নির্ণয়।

"অথ রস নির্ণ্ণয় ॥ সম্ভোগ বিপ্রলম্ব এই দুই ২॥ অম্ভোগে ৪ চারি ॥ বিপ্রলম্বে ৪ ॥ অথ সম্ভোগ জায় ॥ অভিসার ১। বাসক সজ্জা ২। খণ্ডিতা ৩ সাধন ভক্তি ৪ এই চারি ॥ অভিসার অষ্ঠ ॥ উৎকণ্ঠা-ভিসার ২। অস্তকালাভিসার ৩। দিবাভিসার ৪। শ্রীতাভিসার ৫ ॥ তপ্তোভিসার। বাদরাভিসার ৭। তিমিরাভিসার ৮। এই অষ্ঠ ॥ বাসকসয্যা অষ্ঠক। পূর্ব্ব গোষ্ঠ্য ১ রূপ ২ সংরতি ৩। রূপোল্লাস ৪। কিলকিঞ্চিৎ ৫। মিলন রাষ ৬। পরিক্ষা রাষ ৭। নর্ত্তক রাষ ৮। খণ্ডিতামষ্ঠ ॥ হুলি খেলা ১। দানখণ্ড ২। নৌকা খণ্ড ৩। জলকেলি ৪। হিন্দোলা ৫। ঝুলনা ৬। পাসাখেলা ৭। বংশি হরণ এই ৮ ॥ সাধীন ভক্তিকা অষ্ঠ ॥ মহারাষ ১ রাসপুষ্কি ২ নবঢ়া ৩ রসালস ৪। সম্ভোগ ৫। প্রার্থনা ৬। আলস ৭। মানভঞ্জন ৮।

* * *

অথ নায়িকা নির্ণ্ণয় ॥ সাধ্যা ১ মধ্যা ২ প্রগল্‌ভা ৩। মধ্যা ত্রিবিধা। ধীর মধ্যা ১ অধীর মধ্যা ২ ধীরা ধীরা মধ্যা ৩॥ প্রগল্‌ভ। ধীব প্রগল্‌ভ ১ অধীর প্রগল্‌ভ ২ ধীরাধীর প্রগল্‌ভ ৩ মুগধ্যা ১ । ৭ ॥

* * *

অথ মালা নির্ণ্ণয় ॥ রূপমালা ১। রঙ্গমালা ২। সর্ণমালা ৩। বনমালা ৪। ভানুমালা ৫। অনঙ্গমালা ৬। গুণমালা ৭। রসমালা ৮। রত্নমালা ৯। প্রেমমালা ১০। প্রিতমালা ১১। [illegible]লামালা ১২। সুরঙ্গমালা ১৩। বিলাসমালা ১৪। বিদ্যুৎমালা ১৫। কস্তুরীমালা ১৬। প্রজ্ঞমালা ১৭। * * *

সখি পঞ্চ। সখি নিত্য সখি প্রাণ সখি প্রিয় সখি পরম প্রেষ্ঠা সখি ৫। * * * *

অথ সপ্ত দ্বিপ ॥ জম্বু দ্বিপ ব্রহ্ম দ্বিপ কুশদ্বিপ মায়াদ্বিপ বিষ্ণুদ্বিপ নিলদ্বিপ বাউদ্বিপ। সমুদ্র ৭ ॥ লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি্য দধি দুগ্ধ জনান্তকা ৭ ॥” * * *

সুশীল বাবু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরকীয়া তত্ত্ববিষয়ক যে পত্রাকার রচনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ নীম্নে উদ্ধৃত করা হইল: “পরে আমরা কহিলাম গোড়দেশে শ্রীশ্রী৺প্রভুর পাদাঙ্কিত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ভাগবত শাস্ত্রী আছেন এবং সভাসৎ স্থান আছেন তাহারা মহোপাধ্যায় বিচার হইবেক গোড়ে পরকীয় ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা স্বকীয় ধর্ম্ম লবে কেন এখানে যেমৎ সভাসদ্ হইল গোড়দেশে অনেক সভাসদ্ আছে বিচার করিবেক অতএব এখানকার সভাসদ্ এক পণ্ডিত ও এক মনস্বোপদার যায় তবে বিচার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসম্মতমতে শ্রীযুত মহারাজা সভাসদ্ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিঁহো স্বকীয় পরকীয় বিভিন্ন করিলেন তিঁহো দিগ্বিজয় মহারাজার সভা হইতে তাহাকে আনিয়া এবং এক মনস্বোবদার সহিত প্রয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও স্বকীয়ায় দস্তখত করিয়া দিলেন। পরে গোড়দেশে আসিয়া গোস্বামীগণ ও মহান্ত-সন্তান মহান্তশাখাগণ যে যে স্থানে আছেন সর্ব্বত্র অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে বিগ্বিজয়ী স্থানে অজয় পত্র দিলেন পরে শ্রীপাঠখণ্ডে আইলাম তাঁহাদের সহিত অনেক কথোপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুমতাবলম্বী তাঁহার মতাধিকারী শ্রীশ্রী৺ছয় গোস্বামী তাঁহারা যে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেইমত আমরা যাজন করি সেই সব মতের সার গোস্বামীরা বেদ-প্রাণিত এবং ওম্-প্রাণিত এবং রস-প্রাণিত

যে সকল ভাগবত শাস্ত্র করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেক করিয়া আমরা স্বকীয়ার কিমত দস্তখত করিব * * * " ইহার বিবৃতিকালে সুশীল বাবু লিখিয়াছেন—"a passage from an old document dated 1125 B. S. relating to Baishnav triumph of Radha mohan Das Thakur."

নরোত্তম ঠাকুরের আশ্রয় নির্ণয়—

ইতিপূর্ব্বেই রূপগোস্বামীর 'কারিকার' রচনার নমুনা দেখাইয়াছি। এক্ষণে নরোত্তম ঠাকুরের গদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি; "অথ আশ্রম নির্ণয়। আশ্রম পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার। নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় এই পঞ্চপ্রকার। সেবা কয়মত প্রকার হয়। সেবা দুই মত প্রকার হয়। কি কি দুই মত। সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধিরূপে সেবা; প্রেম বলি কারে। শ্রীমতী রাধিকা। প্রেমের অন্তর কি। আশক্তি। আশক্তি বলি কারে। পরকিয়া ভাবে প্রীতি। পাত্র কি! শ্রীরাধা কৃষ্ণ। কোন্ রতি। বিলাস রতি।"

নরোত্তম ঠাকুরের এই আশ্রয় নির্ণয় গ্রন্থের প্রাচীনতম পুঁথির তারিখ সন ১০৯৮ সাল। ইঁহার অপর পুস্তক 'দেহ কড়চা'; দেহ কড়চার প্রাচীতনম পুথির তারিখ ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ। দেহ কড়চাখানিও উপদেশমূলক পুস্তক।

নরোত্তমের দেহ-কড়চা ও আত্মজিজ্ঞাসা দুখানি গ্রন্থই গূঢ় উপদেশ-মূলক। এ দুইখানিতে ভাষা মাধুর্য্য বা অলঙ্কার নৈপুণ্যের নাম মাত্রও নাই। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে দেহ-কড়চার প্রারম্ভ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তৎপার্শ্বে বন্ধনীমধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার পাঠ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন; এই দুই পুস্তকের ভাষার বা বর্ণিতব্য

বিষয়ের কত নিকট সম্বন্ধ তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে সহজেই অনুমিত হইবে :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ [শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ]। [অথো আপ্ত জিজ্ঞাসা] তুমি কে। [আমি কে।] আমি জীব [জিব]। তুমি কোন জীব [কোন জিব]। আমি তটস্থ জিব॥ থাকেন [থাক] কোথা [কথা] ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে [কিরূপে] হইল। তত্ত্ব [তর্ত্ত] বস্ত [বস্ততে] হৈতে [হৈল] তত্ত্ব বস্ত কি কি [কি কি তর্ত্ত বস্ত]। পঞ্চ [পঞ্চ ভূ] আত্মা। একাদশেন্দ্র [একাদষ ইন্দ্রি]। ছয় রিপু ইচ্ছা [জ্ঞান] এক সকল য়েক [এক] যোগে [জোগে হৈল] ভাণ্ড হৈল। পঞ্চাত্মা কে [পঞ্চভূ আত্মা কাথে বলি]। প্রিথিবী আপ তেজঃ বাউ আকাশ [আপু তেজ বাউ বর্জ্জ আকাশ এই পঞ্চ]॥ একাদশীন্দ্র কে কে [একাদস ইন্দ্রি(য়) না(ম) কি]। কর্ম্ম ইন্দ্র পাঁচ [কর্ম্ম পঞ্চ ইন্দ্রি]। জ্ঞানীন্দ্র পাঁচ [জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রি]। আচরন এক [মন এই একাদস ইন্দ্রি]।

নরোত্তম ঠাকুরের বাঙ্গালা গদ্যের আরও নমুনা, যথা—"জাখে দেখি নাঞি তাকে কীরূপে ভাবিব * * * তাথে গর্ভদশা ইব স্থিতি॥ * * তেহোঁ কে॥ তেহঁ প্রথম পুরুষ"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪। ইহা ষোড়শ শতকের রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক পুস্তক পাঠে জানা যায় যে এই নরোত্তম ঠাকুর ১৪৫৩ কি ১৪৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন। ইহা

পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ও মাতার নাম নারায়ণী। কৃষ্ণানন্দ একজন রাজা উপাধিধারী সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের গোলক সংহিতা—

বৃন্দাবন দাসের গোলক সংহিতার ভাষা, যথা—"রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র সনি তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরের পথ চন্দ্র। তদুপরি দুই লক্ষ জোজন তারকমণ্ডল। তদুপরি পঞ্চাশলক্ষ জোজন সপ্তসর্গ। সপ্তদশ লক্ষ জোজন তদুপরি ভুবলোক।"

এই গোলক-সংহিতা ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। ইহা অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রারম্ভ গদ্যে; তবে উত্তরাংশে পদ্যও আছে। গদ্যাংশ হইতে আরও কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শিত হইল :—"সর্ব্বাদৌ মহাশূন্য। তদুপরি অন্ধকার। তদুপরি ধুম্রকার। তদুপরি স্থির পবন। তদুপরি কুর্ম্মরাজ। তদুপরি ঐরাবত। অনন্তের সহস্র ফণা। আর মহাফণা। তারপরে সপ্ত পাতাল। কি কী। অতল ১ বিতল ২ সুতল ৩ তলাতল ৪ রসাতল ৫ মহাতল ৬ পাতাল ৭ এই সপ্ত পাতাল। তদুপরি পৃথিবি। পৃথিবি বেষ্টিত সপ্ত সাগর॥ কি কী॥ লবণ ১ ইক্ষু ২ সুরা ৩ সর্পিস ৪ দধি ৫ দুগ্ধ ৬ জলাম্বকা ৭ সপ্তদ্বিপ বেষ্টিত সপ্ত সাগর। সপ্ত দ্বিপের নাম কি। জম্বুদ্বিপ পক্ষাদ্বিপ কুসাদ্বিপ কাঞ্চনদ্বিপ সাকরদ্বিপ পুস্করদ্বিপ অমন্তদ্বিপ।"

পূর্ব্বোক্ত বাবু সুশীল কুমার দে এই বৈষ্ণব লেখকদিগের গদ্য রচনার কয়েকটি নমুনা দিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা নিম্নে দু একটী উদ্ধৃত করিতেছি :

আশ্রয় নির্ণয় বা ভজন নির্ণয়—

অথ ব্রজে পঞ্চভাব॥ সান্ত ১ দাস্য ২ সখ্য ৩ বাৎসল্য ৪ মধুর ৫ এই

পঞ্চভাব। সান্তের পাত্র কে। সনকাদি মুনিগণ। গুণ কি নিষ্ঠাগুণ। দাস্যের পাত্র ঐশ্বর্য্যে হনুমান ঠাকুর। মাধুর্য্যে ব্রজে সর্ব্বে এবং গোপী-গণ। গুণ কি সেবা। সখ্যের পাত্র কে। ঐসর্য্যে অর্জ্জুন ঠাকুর। মাধুর্য্যে শ্রীদাম সুদামাদি। গুণ কি সমতাগুণ। বাচ্ছল্যের পাত্র কে। ঐসর্য্যে বসুদেব দৈবকি। মাধুর্য্যে নন্দ জসোদা। গুণ কি মমতা গুণ। মধুর ভাবের পাত্র শ্রীরাধিকা এবং ব্রজাঙ্গনা সকল॥ গুণ কি শ্রিঙ্গার। ধাম চারি প্রকার। শ্রীবৃন্দাবন ১ গোলক ২ মথুরা ৩ দ্বারকা ৪।শ্রীবৃন্দা-বনের পাত্র শ্রীনন্দ-নন্দন। গোলকে স্বয়ং ভগবান। মথুরায় বাসুদেব। দ্বারকায় নারায়ন! ভাব দুই প্রকার। ভাব মহাভাব। ভাবের পাত্র গোপীগণ। মহাঁভাবের পাত্র শ্রীমত্তি রাধিকা। ভাব পরকিয়া। কোন পরকিয়া। উর্জ্জল পরকিয়া। কোন উর্জ্জল। রসোর্জ্জল। কোন রস। প্রেমরস। কোন প্রেম। বিলাস প্রেম' কোন বিলাস। মধুর বিলাস। কোন মধুর। জুগল মধুর। কোন জুগল। রাধাকৃষ্ণ।

আত্ম নিরূপণ—

পরম বস্তু হয় জেই কোথা তার স্থিতি। কোথা হইতে আসিয়া করে শতদল পদ্মে স্থিতি। শতদল পদ্মে দেখ সেহ বেহার করে। বেহার সাঙ্গ হৈলে পুনু সেই স্থানে চলে। ব্রহ্ম অক্ষয় বিজ বয়েস নিত্তী কৈসর। নাইকা হইতে স্থিতি॥ নাএকের সঙ্গ হইতে প্রেমরস জন্মিলে। তাহার পরম বস্তুর উৎপতি। তার এক বিন্দু নিকসিলে কামভুবে। কামের দেস হয় কে। চেতন চিন্তিত অঙ্গিকৃত॥ নিতাই চৈতন্য অদ্বৈতে তিন দেসে তিন স্থিতি। মুখে চেতন চৈতন্য বক্ষে চিন্তিত নিত্যানন্দ॥ অঙ্গি-কৃত অদ্বৈত অধেতে॥ তিন দেসে তি নরতি! কামের স্থিতি মস্তকে। তাহাকে সত্তা বলি॥ প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে॥ তাহাকে মহাসত্তা

বলি। সত্য জিব আত্মা ॥ মহায়াত্মা পরময়াত্মা। জিব আত্মা নারায়ন পরম আত্মা ব্রজন্দ্র-নন্দন।

এই স্থলে আর তিনটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রাদির নমুনা, দলিলাদির নমুনা, ও বক্তৃতাদির নমুনা। বাঙ্গালায় চিঠিপত্র লেখা অতিপূর্ব্ব কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গের ধনপতি সদাগর বাণিজ্যার্থে বিদেশ যাইবার সময় গৃহে "পত্রী" রাখিয়া গিয়াছিলেন। আবার 'পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ' প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বেশীর ভাগ পত্রই পদ্যে।

ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন "পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্য লেখা বেশী পাওয়া যায় না। গদ্য—সাহিত্য দেশে অজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়। পুরাতন বাঙ্গালার গদ্য আলোচনা করিতে গেলে, সাহিত্যের অভাবে চিঠি-পত্র দলিল দস্তাবেজ আমাদের উপজীব্য হইয়া উঠে। গদ্য-সাহিত্য ইউরোপীয় প্রভাবেই গড়িয়া উঠে।" শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত "পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের" ভূমিকা পৃষ্ঠা ৸/০—৸৶০।

ফল কথা, এটা বরাবর মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন কালের গদ্য রচনার নমুনা মিলিলেও তখন পদ্য রচনাই বেশী প্রচলিত ছিল। একে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না; তার উপর গদ্য মনে রাখিবার সুবিধা নয়; তাই তখনকার লোকে গদ্য রচনার দিকে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না। রীতিমত বাঙ্গালা ব্যাকরণ বা অভিধানও ছিল না। এক কথায় বলিতে গেলে—গদ্য রচনার দিকে লোকের তাদৃশ যত্ন বা আস্থা ছিল না কেহই "গদ্যকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না।" এইরূপ উপেক্ষায় ও অনাদরে বহু গদ্য গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

সায়েস্তাখাঁর সময়ের একখানা জীর্ণ দলিল—

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার তাঁহার গদ্যসাহিত্য নামক পুস্তকে সায়েস্তা খাঁর সময়ের একখানা মনুষ্য বিক্রয়ের জীর্ণ দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। "তাহা তৎকালিক বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত। তাহা প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি। '৭ স্বস্তি অনুসন্ত্যলক্কৃত সদ্বিরাজ * * বিষম সমর বিজয়ী শ্রীল শ্রীআরঙ্গ সা পাদসা পাদমাভুদায়িনী রাজ্যে তস্বি * * বঙ্গাদি দেশাধিকারি নবাব শ্রীযুক্ত সাইস্তা খান মহাশয়াধিষ্ঠিতে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মানো নিজদেশে ত্রিসংখোত্তর ষোড়শ শত শকাব্দে নসরত সাহী পরগণার অন্তর্গত গকুল বালিয়া গ্রামে সদসি * * রঘুনাথ বিদ্যা * * ভট্টাচার্য্য সদাশয়েষু শ্রীবিরাদাসস্য পুত্রদ্বয় কন্যা বিক্রয় পত্রমিদং ক্রিয়া * * আগে আমি তোমার স্থানে ৯ নতঙ্কা লইয়া আমার পুত্র কুবিরা ও * * এই চাইরজন * * স্থানে স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিলাম। এতদার্থ পত্র দিলাম ইতি * * *'। এ দলিল পণ্ডিতের মুসাবিধা; তাই ইহাতে যাবনিক শব্দ যথেচ্ছা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।" নতুবা দলিলাদিতে আরবী পার্সীর প্রাধান্য সব চেয়ে বেশী। তখনকার বাঙ্গালী দলিলাদি লিখিতে বসিয়া "আপন আপন রাজি রকবতে স্বইচ্ছাপূর্ব্বক সাবুদ আক্কলে বহাল তব্রিয়তে বিক্রয় করিলাম" ইত্যাদি ভূরি ভূরি যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিতেন।

সাধারণ বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে যাবনিক শব্দের প্রাধান্য মুসলমান যুগে খুবই ছিল বটে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে। কিন্তু দলিলাদিতে ইহার প্রয়োগ এখনও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আরবী পার্সী শব্দের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ভ্রমণ কাহিনী—"কাশীর বর্ণনা" ঃ—

পূর্ব্বোক্ত কেদারনাথ মজুমদার আরও বলিয়াছেন ; "অতি প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত দেড় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানা 'কাশীর বর্ণনা' আমার নিকট আছে। * * ইহার নমুনা যথা ঃ 'কাশী বারানসী ব*বাস আনন্দ কানন অভিমুক্ত ধাম মহাশ্মশান বিশ্রামস্থল অর্থাৎ সেহি ক্ষেত্রে শরীর পতন পাইলে পুনশ্চ জন্ম হয় না। মনিকর্ণি সমতীর্থ বিশ্বেশ্বর সমলিঙ্গ নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড গোলকে। বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতি বস্তু লোকের সেহি ধামে শরীর পতন হয়। অথবা ধাম দর্শন হয়ে। সেখানের দণ্ডী করিবার এক্তেয়ার দিয়াছেন কালভৈরব ও দণ্ডপানি এহানরা বেবচারী জীব সকলকে ধামে বাস করিতে দেন না।' এই কাশীর বর্ণনা একখানা ভ্রমণ কাহিনী। * * এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনীর একস্থলে লিখিত আছে 'এহার মাহাত্ম পৃথক পৃথক আছে। সকল স্মরণ নাই।' বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দেবন্দে চৈতন্যের ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কাহিনীর বিশেষত্ব গদ্যে ও সরলতায়।"

দর্শন শাস্ত্র—জ্ঞানাদি সাধনা ঃ—

এইখানে জ্ঞানাদি সাধনা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের খানিকটা নমুনা দিব ঃ—"এখন সত্য বুঝিলাম জন্মাবধি অশ্রোতা জন মনে মনে পিতা মাতাদির নাম করিয়া ডাকিতে পারে না এবং জন্ম অন্ধ জনেহ কুন দিন নবীন নীল মেঘের বর্ণ দেখে নহে সে কি প্রকার মনে মনে নবীন নীল মেঘের বর্ণ চিন্তা করিব এখন সত্য বুঝিলাম জন্ম অন্ধজনে কখন নবীন নীল মেঘের বর্ণচিন্তা করিতে পারে না। সাধু জিজ্ঞাসেন তাহা তুমি কি প্রকারে কহিয়াছিলা

কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয় বিনেহ কেবল মনে মনে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদিকে জ্ঞান করা মাত্র। যদি জন্ম অবধি অশ্রোতা জনে কখ আদি অক্ষর পাঠ করিতে পারে না ও পিতামাতা বন্ধু বান্ধবদিগের নাম করিয়া ডাকিতে পারে না এবং জন্ম অন্ধ জনেহ মনে মনে নবীন নীল বর্ণ চিন্তা করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানী জনেহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এখন তুমি সত্য করিয়া কহ তুমার ঠাঞি শ্রীকৃষ্ণ সত্য কি মিথ্যা। অজ্ঞানী জীবে কহেন আমি অজ্ঞানী কখন ঐ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখের শব্দ আমার কর্ণে শুনি নাই এবং আমার চর্ম্মেতহ তাহার স্পর্শ পাই নাই এবং আমার চক্ষেতহ তাহান শরীরে রূপ দেখি নাই এবং আমার জিহ্বতেহ তাহান প্রসাদের রস পাই নাই এবং আমার নাসিকতেহ তাহান শরীরে গন্ধ পাই নাই অতএব এখন সত্য বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী তোমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা।" উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম যতি যথাস্থানে বসাইয়া এবং 'হ' স্থানে 'ও' দিয়া পড়িলে অনেকটা বর্ত্তমান ভাষার মত দেখাইবে। দীনেশবাবু তাঁহার Bengali Prose Style from 1800 to 1857 নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "The work was probably written about 1700 A. D."

প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য স্মৃতিগ্রন্থ :—

পূর্ব্বোক্ত কেদারনাথ মজুমদার মুসলমান যুগের একখানা হস্তলিখিত গদ্য স্মৃতি গ্রন্থের নমুনাও দিয়াছেন—"অতঃপর স্ত্রীধন নিরূপণ—পতির জীবদ্দশাতে শিল্পকর্ম্ম লব্ধধন এবং পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুল তিন হইতে লব্ধ যে ধন সে স্ত্রীধন না হয়। তাহাতে স্বামীর অধিকার হয়। পতির

জীবদ্দশাতে যে অলঙ্কার ধারণ করে এবং পিতামাতাভর্ত্তৃ হইতে লব্ধ যে স্থাবরাদি ধন সে স্ত্রীধন হয়। তাহাতে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্নে স্ত্রীর দান বিক্রয় অধিকার হয়। ভর্ত্তৃপুত্র পিতৃ ভ্রাতাদের দানগ্রহ গ্রহণে অধিকারী হয় না। দুর্ভিক্ষাদি নিমিত্ত স্ত্রীধন যদি গ্রহণ করে তত্তে সে ধন দিবেক না। ইহার প্রমাণ কাত্যায়নাদি বচন।"

পূর্ব্বোক্ত সুশীল বাবু সন ১২৩৫ সালের হস্তলিখিত পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত ব্যবস্থাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; "অথ অপালন নিমিত্তক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। সর্ব্বথা প্রকারে প্রতিপালন না করে ইহাতে শীত অনিল উদ্বন্ধন শূন্যাগার জলমধ্য অগ্নিদাহ পতন গর্ত্তে ব্যাঘ্র ইত্যাদি নিমিত্তক যদি গোবধ হয় তবে অর্দ্ধ গোচর্ম্ম গাত্রে দিঞা গোসহিত প্রত্যহ যাতায়াৎরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা করিঞা প্রজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত হয় যদি ইতিকর্ত্তব্যতা না কোরিতে পারে তবে ইতিকর্ত্তব্যতা অনুকল্প এক প্রাজাপত্য হয়। অতএব প্রজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়। তদ অনুকল্প ষট্ কার্যাপন বরাটিকা দিবেন। ইহাতে এক সামান্য গোদক্ষিণা হয় তদনুকল্প বৃষমূল্য পঞ্চ কার্য্যা সামান্য গোমূল্য এক কার্ষাপণ এবং ষট কার্ষাপণ বরাটিকা দক্ষিণা হয়। ইহাতে বিশেষ বচনপ্রাপ্ত শূদ্রের প্রাজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়।" বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে ইহার ভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল বলা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালার বক্তা বীরভদ্র গোস্বামী

আর এক কথা—বাঙ্গালায় বক্তৃতার ছড়াছড়ি তখনও এখনকার মত ছিল। কোন রকম উৎসব বা মিলন ক্ষেত্র পাইলেই বক্তারা নিজেদের ক্ষমতা দেখাইতে প্রয়াসী হইতেন। "খেতরীর উৎসবে বীরভদ্র গোস্বামী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দাস তাঁহার ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত 'প্রেমবিলাসে' লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কৈল শ্রীনিবাস।
বীরভদ্র গোস্বামীর হৈল বক্তৃতা প্রকাশ॥

* * * খেতরীর বক্তা বীরভদ্র গোস্বামী একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার 'পাষণ্ড দলন' গ্রন্থে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্য রচনার নিদর্শন আছে; 'অন্যান্য যুগমহাগ্রগণ্য সুধন্য কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সুরধুনী সন্নিধ নবদ্বীপে প্রচ্ছন্নাবির্ভূত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্ভক্তমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত!"

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২—১৭৬০)

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও সাধক রামপ্রসাদ উভয়ে সমসাময়িক। এক বিদ্যাসুন্দর কাব্য দুইজনেই রচনা করিয়াছেন। দুইজনের রচনায় যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয় বলিয়া আলোচনা করিলাম না। "Traces of the Mahomedan influence upon him are distinctly discernible in his (Bharatchandra's) ideas and vocabulary." * কবি ভারতচন্দ্র রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র; দৈবদুর্ব্বিপাকে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় ইনি পরিশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। ইঁহাদের প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩—১৭৭৫)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনাও পদ্যকাব্য আর গান। কাজেই

* A History of Bengali Literature—কুমুদনাথ দাস।

তাঁহার বিষয়েও বিশেষ কিছু বলিবার নাই। রামপ্রসাদ একজন মহাভক্ত এবং বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। তাঁহার রচনায় যথেষ্ট প্রসাদ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই তথাকথিত রামপ্রসাদীসুরের প্রবর্ত্তক। তাঁহার যুগের লেখকদিগের রচনায় প্রচুর অলঙ্কার বাহুল্য দেখা যায়।

মুন্সী জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান (১৭৫০?)

এই যুগের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গদ্য গ্রন্থের মধ্যে কুচবিহারের রাজমুন্সী কায়স্থ জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান অন্যতম। রাজোপাখ্যান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। নমুনা যথা, "শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণারবিন্দ—দ্বন্দ্ব-মকরন্দ অজ্ঞান তিমিরান্ধ জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জন স্থায় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তস্য চরণপ্রান্তে কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক ধরণি-ধরেন্দ্রতনয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীশ্রীআশুতোষ দীন দয়াময় সদাশিব চরণার বন্দ-দ্বন্দ্বে প্রণামান্তর শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ভূদেব ব্রাহ্মণ,সকলের চরণপ্রান্তে প্রণতিপূর্ব্বক বহুতর প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীসদাশিব বংশ-সম্ভব বিহারস্থ দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ কুল শীল বল বীর্য্য শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শান্ত দান্ত বিদ্যা বিনয় বিচার রাজলক্ষণ রাজব্যবহার শরণাগত জন-প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রূপ লাবণ্যাদিতে যিনি তুলনা-রহিত রিপু-কুল-বন-পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ।" ইহা হইতে দেখা যায় সে সময় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে কিরূপ সমাসবদ্ধ লম্বা লম্বা দুর্ব্বোধ্য পদ ব্যবহৃত হইত।

বাঙ্গালায় আরবী পার্সীর বাহুল্য—

মুসলমান আমলে এই বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রচুর আরবী পার্সীর প্রাধান্য ছিল। যুগ সাহিত্যের লক্ষণও তাই। রাজদরবারে রাজভাষার প্রাধান্য থাকিবেই। শোভাবাজারের স্বর্গীয় কুমার অনাথ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর স্বপ্রণীত 'বঙ্গের কবিতা' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—"রামপ্রসাদের বিদ্যু বামনী ও ভারতের হীরামালিনী চরিত্র—কাহারও কাহারও মতে মুসলমানী সাহিত্য হইতে আমদানী। * * * আলীবর্দ্দী সিরাজুদ্দৌলার আমলে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ যে মুসলমানী আদব কায়দায় অভ্যস্ত এবং পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া ও সুশিক্ষিত বা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অঙ্গ মনে করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" তখনকার পাঠ্যপুস্তকাদি ছিল গোলে বকাওয়ালী, লয়লা-মজনু, হাফেজের বয়েৎ, গুলেস্তাঁ, পন্দনামা, বোস্তাঁ, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি। এখনও বাঙ্গালা দলিলাদিতে ভূরি ভূরি আরবী পার্সী মিশ্রিত শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ৺অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জেলেখা পুস্তক হইতে তখনকার বাঙ্গালা গদ্যের নমুনাও দেখাইয়াছেন—"কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ; বল সে কে? যদি সে আসমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমীনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পূরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে

ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে।”

ফলকথা মুসলমানগণের নিকটেও বঙ্গসাহিত্য কম ঋণী নহে : “কাব্য ধর্ম্মতত্ত্ব, সঙ্গীত, ইতিহাস, উপাখ্যান ও পীরপূজা বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুসলমান বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্গভাষা, উহার অভিধান (?), বাঙ্গালীর ব্যবহার বিধি, বাঙ্গালার রীতি নীতি ভদ্রতা ও শিষ্টাচার নানাদিকে মুসলমানের নিকট ঋণী। * * উপাখ্যান কাব্য, পারস্য সাহিত্যেরই সৃষ্টি, এই ক্ষেত্রেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমানের প্রভাবে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। * * * মুসলমানের এই উপাখ্যান কাব্যে ধর্ম্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই, সাহিত্য-রসই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।” *

* বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন—পৃষ্ঠা ৩৫।

তৃতীয় যুগ

ইংরেজ আগমনে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিবর্ত্তন

ইংরেজ আগমনে এ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রোত একেবারে ফিরে গেল। সে বৈষ্ণব গীতি-কবিতা, সে কবিওয়ালাগণের কবিতা, সে ছড়া, সে টপ্পা, সে চণ্ডীর গান, মনসার গান, সে বিদ্যাসুন্দরের মত তরল হাল্‌কা কবিতা,—ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া গেল। বিদ্যাসুন্দরের যুগের সাহিত্যকে অনেকে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের যুগের সাহিত্যের সহিত তুলনা করেন। তুলনা অনেক হিসাবে বেশ মানায় বটে। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন "Grotesque mannerisms, involved syntactical constructions and lavish rhetorical excesses which our literature presented at this stage of its dependence upon exotic sources" এই সময়কার রচনার প্রধান লক্ষণ।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার হেমচন্দ্রের জীবনীতে লিখিয়াছেন: "ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজ এ দেশে নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, [আমরা দেখিতে পাই] "যে অন্ততঃ ষোড়শ শতকের শেষ দশকে পোর্ত্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালাদেশের লোকের কাছে তাহাদের নিজ ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা শিখিয়া তাহাতে বই অনুবাদ করিতেছেন, এবং

এইরূপে বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন একটী সাহিত্যের ধারা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। * * * ও ১৮০০ সালের পর হইতে কেরী, মার্শমান ওয়ার্ড প্রভৃতি পোর্ত্তুগীস পাদ্রি দে-সুজা ও তাঁহার সহকর্ম্মী ও কার্য্যাধিকারীদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া, এক নূতন ইংরেজী-বাঙ্গলা খ্রীষ্টান সাহিত্যের পত্তন করেন।"—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পাদ্রি মানোএল্ দা—আস্সুম্প্সাম্ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ।'

প্রমথ চৌধুরী বলেন—"The English brought prose into Bengal and when rhyme gave place to reason, our literature entered into its modern place * * * Englishmen wrote books for the benefit of Bengalees, and Bengalees wrote books for the benefit of Englishmen, and it seems everybody was anxious to teach everybody else something or other"—Paper on the story of Bengali Literature read by Pramatha Chowdhuri at Darjeeling in 1917. (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে এই পুস্তিকাখানি আছে)।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের একখানা বাঙ্গালা পত্র—

ইংরেজ যুগের প্রারম্ভের বাঙ্গালা গদ্য রচনার অবস্থা তৎকালীন চিঠিপত্র, দলিলাদি ও মামলা মোকদ্দমার কাগজ পত্র হইতে অনেকটা জানিতে পারা যায়। দীনেশবাবু তাঁহার Bengali Prose Style এ পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানা বাঙ্গালা চিঠির নমুনা দিয়াছেন: "অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার

করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল ইহা মকররর মকররর জানিবা নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাগেদ এথা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।" পত্রখানি লিখিয়াছিলেন মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের নিকট, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে।

মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক স্বীয় পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত কয়েকখানি পত্রের নমুনাও প্রদর্শিত হইল :

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্রকুশল পরন্তু শ্রীযুত মিস্তর মেদলটিন সাহেব ৯ই পৌষ সোম দুই প্রহর দিবস কালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারিবে তুমি কোন বিষয়ে অসন্তোষ করিবে না তোমার নামে ওয়াজীবন আরজ লিখাইয়া শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের মিস্তর মেদলটিন সাহেব দিয়া দস্তখত করিয়া লইয়াছি শ্রীযুক্তলালা সুবংশ রায় অল্প দিবসের মধ্যেই যাইবেন ইহার মারফতে পাঠাইব ইহা তোমাকে দিবেন তাহার এক পরামর্শ ঠাওরাইছি লালা মজকুরের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া তাহার মত কার্য্য করিবে জে জে বিপক্ষতা করিতেছে তাহারা পোশমান হবেক দাস্ত মানের দফা এবং আর আর সবিশেষ সকল পশ্চাৎ লিখিব * * * এখানে হামেষ লিখিবে কিমধিকং ইতি ১৩ই পৌষ শুক্রবার সমাচার পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে কোন

বিষএ ভাবিত না হবে শ্রীশ্রী৺মঙ্গল করিবেন আর আর বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত লালা সুবংশ রায় পশ্চাৎ যাইতেছেন তাহার প্রমুখাৎ প্রকু (?) হইবা * * *

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্

সন ১১৭৮ সাল

১৯ শে পৌষের খত

প্রাণপ্রতিমেষু

পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তু ২৫শে তারিখের পত্র ২৭ শে রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম * * * শ্রীযুক্ত রায় জগৎচন্দ্র বিশ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন। যেমত যেমত কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথাতথা যাউন ফলতঃ কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারই মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।

মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক স্বীয় পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের একখানি পত্রের নমুনাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল : তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরস্তঃ [?] ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত ফেতরত আলিখাঁ এর এথানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই। পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটি হইতে আসিয়াছেন যেমত যেমত কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি তথা তথা জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই

বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক তুমি শ্রীযুত মেস্তর মেদলটীন সাহেবের নিকট জাতায়াত করিবে একখত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও স্তুনিবে তখন জেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন জে আমার কথাক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন স্তুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোনও বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে।

"কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে * * * হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ঞিহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে * * * দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে * * *"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০।

১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি মোহনলালের স্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দান পত্রের নমুনা দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন দানপত্রের সময় সম্ভবতঃ ১১৬২ সাল; নমুনা যথা—

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের একখানা দানপত্রের নমুনা—

গোস্বামী জি শংকর গিরিমহান্ত

আমি বানুবিবি ভগবান লালার কন্যা মৃত লালা মোহনলালের বনিতা সাং জাফরাগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ সজ্ঞান চিত্তে ও স্মরণশক্তি বহাল থাকিতে অন্যের বিনা অনুরোধে ও বিনা জবরদস্তি শাস্ত্রানুযায়ী প্রসিদ্ধরূপ একরার এই মত করিতেছি যে মবলকে ১।৩৲২ নাখরাজ জমি তাহাতে কয়েক ঘর প্রজা বসবাস আছে তাহার চৌহদ্দি নিম্নে লিখিত হইয়াছে ঐ জমি সহর মুর্শিদাবাদ নসীপুর মহল্লায় আছে

(স্বাক্ষর) বানুবিবি
জওজে মোহনলাল

আমার স্বামীর খরিদা এতাবৎ দখলে আছে তাহাতে অন্য কাহারও সরাকৎ নাই ও কাহারও দখলে স্বত্ত নাই আপন দখলে রাখি এক্ষনে এই সমস্ত জমি আখড়াস্থিত মহাদেব জিউর মন্দির যাহা আমার মৃত স্বামীর প্রস্তুত করা তাহার মেরামত ও সেবার জন্য প্রশংসিত গোস্বামী মহাশয়কে দিলাম আর কোবালা ও সাবেক যাহা দলিল ছিল তাহাও গোস্বামী মালকেরকে দিলাম জমির মজকুর আপন ভোগদখল হইতে মহান্ত মহাশয়ের ভোগদখলে ছাড়িলাম মহান্ত মহাশয়ের উচিত যে প্রজাদিগের রাজস্ব ও জমিনের উপস্বত্ত পৌত্রাদিক্রমে উশুল তহসিল করিয়া ভোগদখল করিতে থাকিবেন আমি কি আমার ওয়ারীশান কোন দাবী দরপেশ করি ও করে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর এতদর্থে সনন্দ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইসাদি রামগোপাল খিদ্‌মদগার।

পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পরের মোচলিকা পত্র—

"পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পরের একখানা মোচলিকা পত্রের ভাষা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'লিখিতং শ্রীরাজা রামশর্ম্মাও জগন্নাথ শর্ম্মা মুচলিকা পত্রমিদং সন এগার পয়সত্তী অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমাদিগের দুইজনে পৈতৃক খানা বাড়ী ও লঙ্কাহারের গরবাড়ী ও খনিত পুষ্করণী দিগরের বিরোধ। এজন্য শ্রীশ্রী৺মহারাজ সরকারে পরগণে গণকারের কাচারিতে নালিশ করিয়া উভয় কহিলা পরে শ্রীঅভয়চরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণরাম রায়কে মধ্যস্থ মানিয়া যাইতেছি। ইহারা তজবীজ করিয়া যে অবধি, করিয়া দেন। সেই মঞ্জুর হইতে যে অন্য মত করে সে ন্যায় ভঙ্গী দাওয়া হইতে বেদাওয়া এবং সরকার হইতে গুণাগার এতদার্থ মুচলিকা পত্র দিল। ইতি' "*

* কেদারনাথ মজুমদারের গদ্য সাহিত্য।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা দলিলের নমুনা—

এইখানে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের একখানি প্রাচীন জীর্ণ দলিলের নমুনাও প্রদর্শিত হইল: "ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে রাঙ্গরোড়া * * * সুচরিতেষু :—শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইষ বরিষ রঙ্গশ্যাম জওজে রাম রুদ্রতে সাকিন * * অস্য লিখনং আগে আমী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গশ্যাম এহায়ও অন্নবস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্নবস্ত্র দিয়া পরবিষ করে এমত না য়াছে অতএব আপন রাজিরকবতে সচ্ছেন্দ আক্লেবহাল ভবিষ্যতে সেইচ্ছা পুর্ব্বক আমি ও আমার কন্যাবহায় আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রূপাইয়া পুরো ওজন দহমাসী চলনসহী দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্রীবরিষ দাসী অর্থ কর্ম্ম দান বিক্রীরধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদত মৈর্দ্ধে আচাদ হইতে চাহি তবে ১।০ সোয়ামণ হলধি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ চৈদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।"—সাহিত্য, ১৩২০, ৫ম সংখ্যা পৃ, ৪৩৫-৬।

কামিনীকুমার—

কালীকৃষ্ণদাস রচিত কামিনীকুমার নামে একখানা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচনার নমুনা যথা—"কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার আর কি কর্ম্ম করিবেক কেবল হুকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোম্মাকে চোর

চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম।”

ইংরেজ যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য—

ইংরেজ আগমনে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল না, বাঙ্গালা অভিধান ছিল না, বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র ছিল না—ইংরেজের আমলে আমরা এই সবগুলি পাইয়াছি।

“যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রি সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। * * * শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হওয়ায়, ঐ নগর অদ্যাপি ছাপা-অক্ষর নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সাহেব লেখক—

* * ঐ সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত হ্যালহেড্, উইল্কিন্স্, ফরষ্টার, কেরি, মার্সমান এবং কোলব্রুক, স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজ মহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষা সকলের অনুশীলনে ও উন্নতি বিধানে সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সুতরাং দেশীয় ভাষার উন্নতি-প্রার্থীদিগের পক্ষে উক্ত মহোদয়দিগের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।” *

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পাদরী ডফ সাহেবের বিবরণীতেও দেখা যায় “At that time it was but a poor language, like English

* রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

before Chaucer, and had in it, neither by translation nor original composition, no works embodying any subjects of study beyond the merest elements"—Dr. Smith's Life of Alexander Duff.

কিন্তু পাদ্রীগণ বা অন্যান্য ইউরোপীয় সুধীগণ যে নিঃস্বার্থভাবে শুধু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে তাহা মনে হয় না। তদানীন্তন পাদ্রীগণ বা রাজ্যসংস্থাপনেচ্ছু ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালায় আসিয়া বেশ বুঝিতে পারিযাছিলেন যে এদেশীয় লোকেদের সহিত অবাধে মিশিতে হইলে, উত্তমরূপে ইহাদের মনস্তুষ্টি করিতে হইলে— প্রথমতঃ ইহাদের ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করার প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে ইহাদের আচার ব্যবহার প্রচারপদ্ধতি চিন্তাধারা প্রভৃতিও অবগত হওয়ার প্রয়োজন। পাদ্রীগণ দেখিলেন বাঙ্গালীগণকে খৃষ্টধর্ম্মমতে আসক্ত করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝান যত সহজে হৃদয়গ্রাহী হইবে অন্য ভাষায় সেরূপ হইবে না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইউরোপীয়দিগের দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনের মূলে রাজনৈতিক নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনাভিলাষ নিহিত ছিল।

তা' ছাড়া ভাবের স্রোত, ভাষার ভঙ্গী, পদবিন্যাসের ছটা, সমাসের ঘটা, অলঙ্কারের বিড়ম্বনা—ইংরেজ-রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উল্টাইয়া গেল। বর্ত্তমান যুগের ও আগেকার বাঙ্গালা ভাষা একসঙ্গে দেখিলে অনেকে বিশ্বাসই করিবেন না যে দুইটী একই ভাষা। দীনেশ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন "অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির আশা অঙ্কিত না হয়!"

৺রজনীকান্ত গুপ্ত তৎপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনীতে লিখিয়াছেন—"ইংরেজের সমাগমের পূর্ব্বে যে গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার রচনা প্রণালী হৃদয়গ্রাহিণী নহে। উহা যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-বিরহিত। ইংরেজের সময়ে বাঙ্গালায় গদ্য রচনার উৎকর্ষের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ স্বয়ং বাঙ্গালায় গদ্য রচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে রচনার বিষয় সন্নিবেশ করিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা ইংরেজের শিক্ষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজের এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ইংরেজের সমাগমে, মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রামমোহনের ক্ষমতায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৃক্ষের উদ্গম হয়, তাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভায় ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।"

ন্যাথানিয়েল হালহেড (১৭৫১—?)—

ন্যাথানিয়েল হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) নামক একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান খুব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গালা ভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। সাহেব দিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুনা যায় তিনি বাঙ্গালার চলিত গ্রাম্য ভাষা এবং লিখিত শুদ্ধ ভাষা এত উত্তম-রূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে অনেক সময়ে তিনি বাঙ্গালীর দলে বাঙ্গালী সাজিয়া মিশিয়া থাকিতেন।

হালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৭৭৮—

হালহেড সাহেব ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "Grammar of the Bengal

language" নামে ইংরেজী ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাই প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পুস্তক খানির এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তক খানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে—বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গে ্জী।

শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারের সহযোগিতায় চার্লস্ উইল্কিন্স্ সাহেব কর্ত্তৃক ঐ ব্যাকরণখানি হুগলীতে মুদ্রিত হয়।

চার্লস্ উইল্কিন্স্ (১৭৫০—১৮৩৬)

বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনার জন্য উক্ত উইল্কিন্স্ সাহেব এবং পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম চিরস্মরণীয়।

পূর্ব্বে যে ব্রাসি হালহেডের নাম উল্লেখ করা হইল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জন্ হালহেড বাঙ্গালা ভাষা এত উত্তমরূপে অভ্যাস এবং আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তিনি বর্দ্ধমানে বাঙ্গালী সাজিয়া একটী যাত্রাদলে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক—

"তবে Halhedএর ব্যাকরণের পূর্ব্বে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দুইখানি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক লণ্ডননগরে প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড বেণ্টো * 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' নাম দিয়া এই গ্রন্থ দুইখানি রচনা করেন। বেণ্টোর পুস্তকের পূর্ব্বে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে

* রেভারেণ্ড বেণ্টো ১৭২৮ সালে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কলিকাতা ও ব্যাণ্ডেলে অনেকদিন ছিলেন; তিনি ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন; তিনি মারা যান ১৭৮৩ সালে।

Jesuit পাদরী Jeu de Fontenoy, Guy Tachard, Etienne Noel ও Claude de Beze এই চতুগ্রন্থকার লিখিত পুস্তকে বঙ্গ ও ব্রহ্মভাষার অক্ষর ছিল। * * এ ছাড়া আরও দুই একখানি বিলাতী গ্রন্থে বাঙ্গালা বর্ণমালার নমুনা খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারিত। * * * ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক একজন পর্ত্তুগীজ বঙ্গভাষা ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।"—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে।

মানুএল-দা-আসুসুম্প্‌সাঁও—

পুস্তকখানির নাম "Catechisme Suivi De Trois Dialogues কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" (১৭৩৫)। ভাষার নমুনা যথা—

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ কথন

হিন্দু ও মোসলমানেরে জানান বন্ধু হিন্দু ও মোসলমান শুনহ। পুথি সকলের উপর পুথি। শাস্ত্র সকলের উত্তম শাস্ত্র। শাস্ত্রী সকলের উত্তম শাস্ত্রী। কৃস্তর শাস্ত্রী কৃপার শাস্ত্র এবং কৃপার শাস্ত্রের পুথি।

এই পুথিতে শুনহ মন দিয়া পাইবা বুঝন বুঝান বুঝিবার বুঝাইবার উপায় তরিবার আত্মার বেদের অর্থ শুনহ শুনাও। পৃথক জানিয়া বুঝহ বুঝাও। পরিণামের পথ ধর ধরাও। গুরু শিষ্যের ন্যায়েতে ন্যায় করিতে শিখহ শিখাও। ইহা জানিয়া বুঝিয়া মানিয়া মুক্তি হইবেক। দশ আজ্ঞা পালন কর যদি।"

এই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" (Crepar Xaxtrer Orthbhed) পুস্তকে অনেকগুলি খ্রীষ্টান সাধুর ইতিবৃত্ত ও অন্য

আখ্যায়িকা আছে ; বড় বড় গদ্য রচনা আছে ; [এই গ্রন্থখানি] পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যের ও সাধারণ শব্দসম্পদের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পত্তনে সাহায্য করার দরুণ পাদ্রি মানুএল—দা—আস্‌সুম্প্‌সাঁউ বাঙ্গালা সাহিত্যের' ইতিহাসে অন্ততঃ একটী পৃষ্ঠার দাবী করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণকার ও কোষকার বলিয়া উচ্চস্থান তাঁহার প্রাপ্য।' প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত "পাদ্রি মানুএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের" ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাবু সুশীলকুমার দে স্বপ্রণীত 'Bengali Literature in the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ (not ভেদ)। সুর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের। আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি। সহর চন্দন নগর। এবং সমস্ত বাঙ্গলা দেশের নিমিত্তে। করিয়াছেন জাকবছ ফ্রনছিস্কাস মারিয়া গেরেন। চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্যর পাদরী। দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১৮৩৬"

এতদ্ব্যতীত সুশীলবাবু আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন : "Catechism of the Christian Doctrine in the form of a dialogue"—written in two volumes in Bengalla and Portuguese; printed in 8 vo. at Lisbon in 1743.

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" হইতে একটী কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ; আর বলিয়াছেন—আধুনিক বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যের এক পূর্ব্বতমরূপ বলিয়া ইহাকে নেওয়া চলে :—

"হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই কুলীন পুরুষ শত্রু আছিল; বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাস করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল; লাগাল পাইয়া দুইজনে ও তরোয়াল খসিয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজোবন্ত সে আরো এক চোট, যে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রুরে মাফ চাহিয়া কহিল: ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর; তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন। জিননিয়া কহিল: খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল; রক্তও পোঁছাইল, ঔষধও দিল, পরে দুইজন মিলিয়া বড় দোস্ত হইল। জিননিয়া ধর্ম্ম ঘরে গেল। ধর্ম্ম ঘরেতে স্তব করিল, স্তব করিয়া যে খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল; আঁঠু করিয়া খ্রীস্তর আকৃতির কাছে তাহান পদেতে চুম দিল। তখন আকৃতিএ আঠের খিল খসিয়া, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন! এ মহা অপূর্ব্ব সে আপনে দেখিল, এবং যত লোক ধর্ম্ম ঘরে আছিল, সকলেও দেখিল। জিননিয়া পরমেশ্বরের পূজ্য ছিল; যতদিন বাঁচিল অনেক পুণ্য করিলণ। বৃদ্ধকালে পুণ্যে পূর্ণিত মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।"—বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পত্তনকারী পাদরী-দের মধ্যে ইঁনিও একজন—সন্দেহ নাই। ইঁহার রচিত অপর পুস্তক বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান—যাহা তিনি ভাওয়ালে বসিয়া ১৭৩৪ সালে লেখেন।

হেন্‌রি ফর্ষ্টার (১৭৬১—?)—

Henry Pitts Forster নামে আর একজন সাহেব ছিলেন।

তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'The great Cornwallis Code' তিনি ১৭৯৩ সালে বঙ্গভাষায় অনূদিত করেন। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে : শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হুজুর কৌন্‌সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৭৯৩। Second Edition in 1826. তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'অভিধান'; যাহার প্রথম খণ্ড ১৭৯৯ সালে মুদ্রিত হয়; পুস্তকখানির নাম A vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa. ইঁহার অপর পুস্তক "An Essay on the Principles of Sanskrit Grammar" (1810).

উক্ত হালহেড সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন সমস্ত বাঙ্গালা দেশে কারবারের জন্য বাঙ্গালা পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিত হইত। উক্ত পত্রাদিতে যে বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহৃত হইত তাহার ভাষা অনেকটা সহজ ও সরল ছিল। ঐ সময় বাঙ্গালা ভাষায় যে যে শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত হইত এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক শব্দের প্রয়োগই এখন আর দেখা যায় না; কতক শব্দ ভিন্নঅর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার অনেক নূতন শব্দ এখন ব্যবহৃত হইতেছে যাহার প্রচলন তখন ছিল না।

বাঙ্গালা ভাষার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে উক্ত হালহেড সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে লিখিয়াছেন "Bengali is at present in the same state with Greece before the time of Thucydides when Poetry was the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown."

শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র

বস্তুতঃ সাহেবরাই এদেশে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালায় ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি রচিত ও মুদ্রিত করেন। যদি ইঁহারা সে সময় বিপুল অর্থব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির জন্য ব্যাকরণ অভিধানাদি না লিখিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা এখনকার বর্ত্তমান মহিমময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালা ভাষায় গীতিকবিতা ও পদ্যসাহিত্য যেমন বৈষ্ণব কবিদিগের হস্তেই উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি লাভ করে সেইরূপ খৃষ্টান পাদরীদের হাতেই বাঙ্গালা গদ্যরচনা রীতিমত অনুশীলিত হয়। আবার তাঁহারাই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রণের সুব্যবস্থা বিধান করেন। *

"It was about this time (first quarter of the 19th century) that three noble-hearted missionaries Carey, Marshman and Ward set up a College and a printing press at Serampore and issued a vernacular journal—Samachar Darpan. A new era in Bengali literature dawned at this time and all-round epoch-making changes were effected in our life and letters by the fusion of the Eastern and Western culture. A splendid prose literature with different

* কিন্তু দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন নামক পুস্তকের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় হুগলীর বর্ণনায় আছে—"এই হুগলী নগরেই প্রথমে ছাপাখানার সৃষ্টি হয়। হলহেড ও উইলকিন্স সাহেব সর্ব্বপ্রথমে ঐ প্রেসে বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন।"

branches owed its inception during the middle of the 19th. century, and the composition of dramas, epics and lyrics upon the basis of an intelligent assimilation of the best ideals of the Orient and the Occident commenced from this time. * * * Mr. Wilkins set up a Bengali printing press at Hughli and composed a Bengali Grammar Mr Foster (Froster ?) wrote the first Bengali Dictionary in 1799 and also rendered tbe Govt. laws fro.. English in Bengali."— কুমুদনাথ দাসের History of Bengali Literature.

উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯—১৮২৩)—

ইতিপূর্ব্বে যে তিনজন মহাপ্রাণ পাদরী সাহেবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে রেভারেণ্ড,উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন ; ও পরে কেরীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে ছাপাখানার কার্য্যাবলী দেখিতেন। এবং কেরীকে অনেক পুস্তক মুদ্রণের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি "পীতাম্বর সিংহের চরিত্র" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জন, এফ, এলার্টন (১৭৬৮—১৮২০)—

এই সময়ের আর একজন সাহেব লেখক জন এফ এলার্টন (John F. Ellerton)—তাঁহার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ যোগ্য :—

(১) মঙ্গল সমাচার মতিউ রচিত ; কলিকাতা হইতে ১৮১৯ সালে প্রকাশিত—

(২) মঙ্গল সমাচার যোহন রচিত ; কলিকাতা হইতে ১৮১৯ সালে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় প্রকাশিত—

(৩) জগত্তারক প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ; কলিকাতা হইতে ১৮২০ সালে প্রকাশিত—

(৪) গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ধারাতে সৃষ্ট্যাদির বিবরণ ; ১৮২০ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০)—

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সাহেবদের বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য যখন কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হয়, কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। * সাহেবদিগকে পড়াইবার জন্য

---

* Lord Wellesley, finding the Civil Servants imperfectly acquainted with the language of the country, established the College of Fort William in Calcutta, in the year 1800. * * * Able Pundits were retained; and various works in Bengalee and other language, were compiled and printed; and thus a new impulse was given to the improvement of the country. The learned Mrityunjoy, a native of Orissa, was appointed chief of the Native Department, and reflected high honour on the institution by his great talents.—Marshman's History of Bengal—Section XVIII. P. 252.

ঐ সময় কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ কলেজে থাকিয়াই কেরি সাহেব বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ব্যাকরণ ও অভিধান লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে সে ব্যাকরণ দুষ্প্রাপ্য হইলেও, অভিধানখানি দেখিতে পাওয়া যায়। "ঐ অভিধান রচনায় উক্ত কেরি সাহেবের অসামান্য বিদ্যা অপরিসীম যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রদর্শিত হইয়াছে।" কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। "এই গ্রন্থগুলি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত হইতে বিভিন্ন সময়ে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আসে।"

বিলাতে মুদ্রিত একখানা গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের অনুলিপি

পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার বিলাতে মুদ্রিত সেই সকল গ্রন্থের একখানার প্রচ্ছদপত্রের অনুলিপি দিয়াছেন—

"The Fort William College rendered valuable service to the cause of Bengali language and literature It gave the language its grammar & dictionary and supplied it with reading books for a preliminary study. * * The College had benefited the literature of Bengal, had imparted to it a new spirit which would bring about its rejuvenation"—Western Influence in Bengali Literature (p. 62) by Priya Ranjan Sen.

"To the efforts of the Fort William Pundits we chiefly owe the regeneration of intellectual activites in this country"—Sushil K. De.

শ্রী—

বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রী—

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণ রচিত

লন্দন মহানগরে চাপা হইল

১৮১৬

তবে, সে সময়কার রচনামাত্রেই উৎকট লম্বা লম্বা সমাসে ভরা! নিম্নে কয়েকটী লেখকের রচনার নমুনা প্রদর্শিত হইল।

প্রাচীন শিশুবোধক—রচনার নমুনা (১৮০০)

প্রাচীন একখানি শিশুবোধকে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর পত্রালাপের যে আদর্শ আছে তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায় সে সময়ের ভাষা কিরূপ ছিল :

"স্বামীর প্রতি স্ত্রীর পত্র—

শিরোণামা ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।

শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ-সরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভ বিশেষ। পরে মহাশয় ধনাভিলাসে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন, যেকালে এ দাসীর কালরূপ-লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুইকালের সুখকর

বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।”
বাহুল্যভয়ে উত্তরলিপির নমুনা উদ্ধৃত করা হইল না।

মিলারের বাঙ্গালা অভিধান

১৮০১ খৃষ্টাব্দে Miller সাহেব একখানি বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রিত করেন।

কেরি (১৭৬১—১৮৩৪)

এই যুগে যে সকল সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের জন্য প্রাণপাত পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছিলেন মহানুভব উইলিয়ম কেরি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বিপুল পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তখনকার দিনে পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য এখনকার মত সুকর ছিল না। কিন্তু মহাত্মা কেরি সকল ক্লেশ সকল বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে ঐ সকল বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি তদানীন্তন সাহেবরা কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতেই সহজে অনুমিত হইবে :

হেয়ার্ কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেন তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

উইলিয়ম কেরির বাঙ্গালা সাহিত্য পরিচর্য্যা সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন : “Carey's claim to importance as a contributor to Bengali literature does not rest so much upon his Bible-translations and numerous tracts on Christianity, but on the works which be produced in another spher

of usefulness but on which he himself seems to have laid less emphasis although they show him in a better light as a writer of Bengali."

কথোপকথন (১৮০১)

কেরি-কৃত কথোপকথন—১৮০১ সালের রচনা। ইহার নমুনা যথা—"ঘটক মহাশয়—আমার বড় পুত্রতির বিবাহ দিব আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন বিস্তর দিবস গৌণ না হয় বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাই। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব এখন না হইলে যে খরচ আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক্ কি। আপনার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগার কন্যা উপস্থিত আছে যেখানে বলেন সেইখানে স্থির করিয়া আসি। কুলীন গ্রামে হরহরি বসুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন দুধে আলতার গোলা আর কর্ম্মেও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।"

একজন মাত্র লেখকের একখানি পুস্তক হইতে অধিক নমুনা উদ্ধৃত করিলে বর্ত্তমান পুস্তকের কলেবর অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত হয়; কিন্তু উইলিয়ম কেরির কথোপকথন পুস্তক হইতে এইরূপ একটি মাত্র উদ্ধৃতাংশে যাঁরা তাঁহার অলৌকিক রচনা নৈপুণ্যের কিছুই দেখান যায় না; এই

পুস্তকখানিতে তিনি তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞানের এবং চলিত বাঙ্গালার রচনা শক্তির যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপে জানিতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন : "Carey's extraordinary command over colloquial Bengali is nowhere better exhibited. The extent and variety of topics, the different situations and the different classes of men dealt with in these dialogues show not only a minute and sympathetic observation and familiarity with the daily occupations of the people, their manners, feelings and ideas but also a thorough acquaintance with the resources of the language in its difficult colloquial forms. The book is indeed a rich quarry of the idioms of the spoken dialect of Bengal. The book also gives a faithful reflection of the social life in Bengal as it existed a century ago."

বঙ্গ সাহিত্যে কেরি সাহেবের স্থান—

বঙ্গ সাহিত্যে কেরি সাহেবের স্থান বিচার করিতে হইলে, দেখিতে পাই যে, যে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্য-বিস্তৃতি-বিষয়ে পুরা রকম আস্থাহীন ও উদাসীন—বরং সকলে ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় বিশেষ ব্যাকুল ও উন্মাদপ্রায়, বঙ্গভাষা নিতান্ত অনাদৃত ও ঘৃণিত, লিখিত ভাষার তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মকানুন নাই, প্রাচীন কবিওয়ালার দলেরও প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্রমশঃ নিপ্রভ এবং অস্তমিত—ঠিক এইরূপ সময় ডাক্তার কেরি নিজ অলোক-সামান্য

ক্ষমতা সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের যে উন্নতি সংসাধন করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়; তখন বাঙ্গালায় অভিধান ছিল না, ব্যাকরণ ছিল না, ইতিহাস ছিল না, ভাল উপদেশপ্রদ পাঠ্যপুস্তক বা গল্পের বই ছিল না, হাতের লেখা কতিপয় মাত্র পুথি ব্যতীত ছাপা পুস্তকও ছিল না—কেরি একা প্রভূত উদ্যম ও পরিশ্রম সহকারে এই সমস্ত অভাব মোচন করেন। শিক্ষা বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করিবার এবং সেই উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল সত্য; বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকসকল প্রণয়ন দ্বারাও বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিযাছেন সত্য; কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিয়াছেন বঙ্গভাষার একটা সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত গদ্য-সাহিত্য সংগঠন দ্বারা; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি কেরির মোটেই ছিল না। অনুবাদেই তাঁহার সকল শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এটা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে কেরি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান তৈয়ার করিয়া যান।

ইতিহাসমালা ১৮১২—

কেরি লিখিত অপর পুস্তক ইতিহাসমালা (১৮১২)। নমুনা যথা: "ধনপতি নামে এক সওদাগর লহনা নামে তাঁহার স্ত্রী সে লহনাকে বিবাহ করিলে অনেক দিবস সন্তান জন্মিল না অতএব তাহাকে বন্ধ্যা জ্ঞান করিয়া সওদাগর পুনরায় লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনা নামে জগন্মোহিনী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে আনিল। ধনপতি কিছুদিনের পরে বাণিজ্যে গেলে সে সওদাগরের ঘরে দোবলা নামে এক দাসী থাকে সে দাসী লহনাকে কহিল তুমি এখন যৌবনহীনা ও বয়ধিকা খুল্লনা পরম সুন্দরী তাহার রূপ লাবণ্যে সওদাগর বশ হইলে তোমাকে

চাহিবে না অতএব খুল্লনাকে অন্ন কষ্ট দাও তাহার যৌবন নষ্ট কর। লহনা দোবলার কথা শুনিয়া মনে বুঝিল যে দোবলা ভাল বলিয়াছে। পরে লহনা ধনপতি সওদাগরের জবানী কপট পত্র রচনা করিল সে পত্রে এই লহনাকে লিখিল আমি যে কন্যা বিবাহ করিয়াছি সে রাক্ষসী তাহাকে বিবাহ করিয়া বড় কষ্ট পাইলাম অতএব দিবা তারে অন্নকষ্ট, করিবা যৌবন নষ্ট রাখাইবা তাহারে ছাগল। এই পত্র শুনিয়া খুল্লনা জলিয়া গেল। দুই সতীনে গালাগালি মুখোমুখি তারপর ধরাধরি চুলাচুলি তারপর কিলাকিলি হইতে বলেতে লহনার খুল্লনার সকল অলঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে চিড়া কানি পরাইয়া ছাগল রক্ষণে নিযুক্ত করিল।"

উইলিয়ম কেরি বিরচিত 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' সম্বন্ধে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন "The last two books form a rich mine of idioms of the spoken dialect of Bengal from which Tekchand Thakur took the cue for his style in the composition of his masterpiece in Bangali —the Alaler Ghorer Dulal"

বাঙ্গালা অভিধান (১৮১৫—২৫)—

ডাক্তার কেরির আর একখানি সুবৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য পুস্তক— A Dictionary of the Bengali Language (1815—25): ইহার জন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে তৎকালীন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ জুন তারিখের সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই: "বাঙ্গালা "ডেকসিয়ানরি"।" আমরা অতিশয় আহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত ডাক্তার

কেরি সাহেব পোনর বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরেজি ডেকসিয়ানারি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশটাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেব কৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদি-ক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।" * এই উদ্ধৃতাংশ হইতে সে সময়কার সংবাদ পত্রের ভাষার সম্বন্ধেও কথকটা আভাস পাওয়া যায়।

ফিলিক্স কেরি (১৭৮৬-১৮২২) ইংলণ্ডের ইতিহাস ১৮১৯—

উক্ত উইলিয়ম কেরির পুত্র ফিলিক্স কেরি 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' নামক একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন (১৮১৯)। তাষার নমুনা—"রাজা হেনরির প্রথমত রাজত্ব করণের শৃঙ্খলা দ্বারা প্রজারা নিশ্চয় করিল যে এ রাজা সুবিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাপালন করিবেন এই হেতুক ঐ রাজা আত্মপরাক্রম জানিয়া রাজ্যমধ্যে যে যে কুনীতি হইয়াছিল এবং যে যে সকল পূর্ব্বীয় রাজগণের তাচ্ছল্য এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে যে কুব্যবহার হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাজ্যবিষয়কারি সৈন্যেরদিগকে তৎক্ষণে স্ব স্ব কর্ম্মচ্যুত করিলেন।"—পৃষ্ঠা ৩৮

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা'—৬২ পৃষ্ঠা।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদ পত্রোপরি লিখিত অছে :

"ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়,

অর্থাৎ

জুলিয়াস্ কাইসরের ব্রিটিন দেশাতিক্রম সময়াবধি,

আইমেন্স্ নামে প্রসিদ্ধ সন্ধি সময় পর্য্যন্ত,

মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়

তন্মধ্যে জুলিয়াস কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জনামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত

গোল্‌দ্‌স্মিৎ উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবরণী কৃত ;

এবং

ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধি সময় পর্য্যন্ত,

অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবরণী কৃত

ফিলিক্স কেরি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় কৃত

C. S. B. S.

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি

শন ১৮১৯."

এই পুস্তকের একখণ্ড উত্তরপাড়া পাব্লিক লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তকখানিতে একটী Glossary সংযোজিত আছে। তাহাতে ইংরেজী শব্দ সমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে ; ঐ সকল বাঙ্গালা প্রতিশব্দ

বর্ত্তমান প্রচলিত বাঙ্গালা হিসাবে স্থানে স্থানে বিসদৃশ এবং কৌতুকোদ্দীপক, যথা :—

Alderman	প্রাচীন পদস্থ, প্রাচীনাখ্যপদস্থ
Aristocracy	কুলীন প্রভুত্ব
Commoner	প্রজা প্রতিনিধি সভ্য
Duel	দুইজন যুদ্ধ, উভয় যুদ্ধ
Fellow (of a College)	সমছাত্র
Harbour	নঙ্গর বাড়ী
Immunity	লভ্য, নিশা
Incest	জ্ঞাতিগামী
Indulgences	পাপক্ষমাপত্র
Knight errant	ভ্রমণকারী অশ্বারূঢ়
Knight of the Garter	ফীতাধ্বজোধ্ কুলীন
Mace	চোব
Martyr	সাক্ষী, সাক্ষ্যেদত্তপ্রাণ
Morter	গোবড়া, গর্নাল
Outlawry	ভ্রষ্ট স্থায়
Pillory	চক্রাকার হাড়ি
Redoubt	পানীখানা
Revolution	প্রভুত্ব পরিবর্ত্তন
Sound	উপখোল
Upper House	কুলীন সভাস্থল
Viscount	দেশোপভোগী

Whit Sunday	শ্বেত বস্ত্র পর্ব্ব
Wind-mill	বায়ুপ্রচোত্তকল

ফিলিক্স কেরির অপর পুস্তক যাত্রিরদের অগ্রসর বিবরণ। পুস্তকখানি ইংরেজী Pilgrim's Progress নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কিন্তু ফিলিক্স কেরির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী। তৎপ্রথমগ্রন্থ। ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। ফিলিক্স কেরি কর্তৃক পঞ্চমবার ছাপাকৃত এন্‌সেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নাম গ্রন্থাবলী হইলে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। গরিষ্ঠ উলিআম্ কেরি কর্তৃক তর্জ্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ভাষা বিবেচিত ও শ্রীকবিচন্দ্র তর্ক-শিরোমণি কর্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুরে মিশিয়ন ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০।" পুস্তকখানি ৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী।

উক্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরা যে সকল বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনা করিতেন তাহা হইতে তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা স্বরূপ একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধটী "জাতিবিভাগ হিন্দুদিগের উন্নতির কতদূর অন্তরায়"—এতদবলম্বনে লিখিত: হিন্দু-লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যাবৃদ্ধির হানি হয়।

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং ঋতুতাপ্রাপ্তিসম্বাদিভ্রমস্থায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্নদেশীয় লোকেরদের ভিন্ন ভিন্ন রীতির এই কারণ যে আপন আপন স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থাকরণ কালে এই দুই

কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব্বদেশে পৃথক পৃথক ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবস্থ মান্য হইয়াছে। * * *

ব্রাহ্মণেরা বলে সৃষ্ট্যারম্ভে ঈশ্বর পৃথক পৃথক চারিবর্ণ সৃজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারদিগের পৃথক পৃথক ধর্ম্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই শুদ্ধাচার যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণ রক্ষণ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসন শিষ্টপালন দুষ্টদমন রাজ্যশাসন প্রজাপালন ন্যায্য করগ্রহণ বৈশ্যবৃত্তি কৃষিকর্ম্ম এবং বাণিজ্য শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণসেবা মাত্র। * * *

অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না। * * *" †

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ (লাইব্রেরিয়ান) ছিলেন মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। তিনি ১৮১০ সালে 'English-Bengali Vocabulary' নামে একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়া ডাক্তার কেরীকে উৎসর্গ করেন।

স্বনামধন্য রাজা রাধাকান্ত দেবও এই সময়ে একখানি 'বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস' নামীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের ৩০—৬—১৮২১

† —কথিত আছে—অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

তারিখের উদ্ধৃত সংবাদ হইতে রাধাকান্ত দেবের এই পুস্তকখানির বিশেষ বিবরণ জানা যায়ঃ "নূতন পুস্তক।—এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর যুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরাক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ষট্‌কারক ও তিনকাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাবধি আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

রাম রাম বসু—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের মধ্যে রাম রাম বসু অন্যতম। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও

১৮০২ খৃষ্টাব্দে 'লিপিমালা' নামক দুই গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। "Carey says of Ram Ram Basu that he was a scholar of uncommon attainments in Persian and Sanskrit."—Bengali Prose Style by Dinesh chandra Sen. অন্যত্র বলিয়াছেন "A more devout scholar than him I did never see." মার্শম্যান সাহেব রাম রাম বসু সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "one of the most accomplished Bengali scholars of the day" সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন: "Ram Ram Basu was the first native original writer in modern Bengali prose" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করিবার পূর্ব্বে রাম রাম বসু কেরি সাহেবের মুন্সী ছিলেন। রাম রাম বসুর রচনায় পার্শীর বাহুল্য থাকার জন্য জেম্‌স্ লঙ্ সাহেব তাঁহার ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Kind of mosaic, half Persian, half Bengali" indicating "the pernicious influence which the Mahamadans had exercised over the Sanscrit-derived languages of India."

সুশীলকুমার দে'ও বলিয়াছেন "It is true that Persian words occur more or less in every writing of this period * * * In Lipimala however the influence of Persian is almost absent."

প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)—

ইহার রচনায় তত সংস্কৃতের ছড়াছড়ি না থাকিলেও আরবী পার্শী শব্দের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের

ভাষার নমুনা যথা: "পরে জৌতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপণ করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ববিষয়েতেই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। মহারাজা ইহাতে হবিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন যথেষ্ট মতেতে করিলেন সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া অন্নপ্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য। পর পর কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্তরায়ের অতি প্রীতি কুমারের প্রতি। কতককাল পরে কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল। দশ বারো বৎসরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখাপড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।" ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তখনও আরবি পারসি শিক্ষার সমধিক কদর ছিল। অন্যত্র: "একপোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরি তার চারিদিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল, পুবের দিকে সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেটকাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ—আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নওবৎখানা—তাহাতে অনেক অনেক প্রকার যন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ডপূর্ণ হবামাত্রেই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।" 'এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া রাম রাম বসু কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে তিন শত টাকা পারিতোষিক পান।'

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছেঃ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে। একব্বর বাদশাহের আমলে। রাম রাম বসু রচিত্। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ হইতে নিখিলনাথ রায় এই রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের এক সুন্দর সংস্করণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

১৮০১ সালে মুদ্রিত মূল প্রতাপাদিত্য চরিত্রের একখণ্ড পুস্তক "বোর্ড অফ একজামিনার্স" এর পুস্তকাগারে আছে। গ্রন্থারম্ভে রাম রাম বসু লিখিয়াছেনঃ "সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গরূপে সামুদায়িক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এজন্য যেমন আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।"

বাস্তবিক পক্ষে পুরাদস্তুর রকমে বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ বলিতে গেলে রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্রই প্রথম গ্রন্থ; এবং ইহাই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক পুস্তক। ঠিক ইতিহাসরূপে লিখিত না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অপেক্ষা ভাল ঐতিহাসিক পুস্তক ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয় নাই: ইহার জন্যও রাম রাম বসু যথেষ্ট প্রশংসা পাইবার যোগ্য—সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকখানিকে সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য লেখক যত্নের বা চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই; কোথাও সুন্দর চিত্রাঙ্কন দ্বারা,

বিদ্যাসাগরের যুগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১)—

এইবার আমরা 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-পরিচর্য্যা সংক্ষেপে অনুশীলন করিব। অধুনা যে বঙ্গভাষা অনুপম শোভারাশিতে পরিশোভিতা হইয়া পাঠকগণের দর্শনেন্দ্রিয়ের তথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, যে সুমধুর ভাষার সুললিত পদবিন্যাস সপ্তস্বরা বীণার তাললয় পরিশুদ্ধ ঝঙ্কারের মত ইদানীং আমাদিগের কর্ণকুহরে পীযুষধারা বর্ষণ করিতেছে, যে ভাষার ভুবনমোহিনী শক্তি ও বহু বিভূতি বিলোকনে আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় প্রভূত আনন্দরসে পরিপ্লুত, যে ভাষার ক্রমোন্নতি ও পরিবর্দ্ধমাণ অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ে আজ যুগপৎ অপলকনেত্রে তাকাইয়া আছে,—সেই বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি-সংসাধনের নিমিত্ত, তাহার হীনবলদেহে শক্তিবারি সিঞ্চনের জন্য, পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুভক্ষণে শুভলগ্নে লেখনী ধারণ করেন। তিনিই এই নিপতিত অনাদৃত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া সারাজীবন অবিচলিত ধৈর্য্য ও অক্লান্ত উত্তমসহকারে ইহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে নিদারুণ দুঃখশোক-ভারাক্রান্ত অবস্থায় যে ভাষায় রোদন করিয়াছি, যে ভাষায় হাসিয়া স্নেহময়ী জননীর প্রীতিসংবর্দ্ধন

করিয়াছি, ছেলেবেলার ধূলাখেলার ও আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, যে ভাষায় কাঁদিয়া হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রাণের দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিয়াছি, যে ভাষার অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি প্রভাবে প্রাণ-মাতান চিরমধুময় পীযূষপূরিত 'মা' শব্দ আমাদের মনের নিদারুণ শোকানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে—সেই ভাষা, আমাদের চির-প্রিয় সেই বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাসাগরের অমরতুলিকাস্পর্শে নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে। অধিক কি, তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে অতি সুমার্জ্জিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গভাষাকে এইরূপ গঠন করাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। * * *

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের * * ঔদাসীন্যকালে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ফলহীন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র অরণ্য ও কণ্টকে আবৃত; চতুর্দ্দিকে নীরসতা ও অনুর্ব্বরতার লক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিয়া অরণ্যাদি পরিষ্কৃত করিয়া তথায় ফলবান বৃক্ষাদি বপন করিয়া, সেই মরুসদৃশ কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশকে একটী সুন্দর উদ্যানে পরিণত করিলেন। তিনি অমূল্য সুন্দর কোষাগার হইতে অতি মূল্যবান সুন্দর ভাবরত্নমালা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপে ব্যবহার করিলেন। এই অপূর্ব্ব অলঙ্কার নির্ম্মাণে, তাঁহার কারুকার্য্য ও দক্ষতা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইল। তিনি হৃদয়গ্রাহী নূতন বঙ্গগদ্য সৃষ্টি করিলেন।" ‡

‡ বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী—যতীন্দ্রনাথ বসু।

বাস্তবিক বিদ্যাসাগরের ভাষা পূর্ব্বেকার ভাষা অপেক্ষা মধুর এবং প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী এবং সারগর্ভ। তাঁহার প্রথম রচনা বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে)। "এইরূপ সুমধুর পদ বিন্যাস, ভাষা ও ভাবের সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় নাই। রচনা বিষয়ে বেতাল সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।" পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"একমাত্র বেতাল পঞ্চবিংশতির দ্বারাই ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের সুদৃঢ় উন্নতিমূল স্থাপিত হইল। তখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবকাল; তখনও লোকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পারিত না, সুতরাং ইহা দৃঢ়তাসহকারে বলা যাইতে পারে যে, বেতালের তাললয়—সংযুক্ত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষার দ্বারাই সুন্দর বঙ্গগদ্যের আদর ও উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হইল। বেতালে একদিকে যেমন শব্দবৈচিত্র্য অপরদিকে তদ্রূপ প্রাঞ্জলতা ও সুললিত ভাবমালার সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বেতাল প্রকাশের সহিতই বঙ্গগদ্যসাহিত্য সম্পূর্ণ এক নূতন দিকে ধাবিত হইল। * * * বেতালে ভাবের আদিত্ব নাই, কিন্তু ইহাতে যে লালিত্য, যে বর্ণনা বৈচিত্র্য এবং সুমধুরতা আছে, তাহা তাঁহার স্বরচিত এবং তজ্জন্যই বেতাল সাধারণ লোক কর্ত্তৃক এতদূর আদৃত হইয়াছিল।"

তাঁহার 'জীবন-চরিত' বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম রত্ন। তিনি বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব দেখিয়া 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৯), 'বোধোদয়', শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। "শকুন্তলার সমাগমে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব্ব

ধারণ করিল। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদয় দেখা দিল। শকুন্তলায় তাঁহার লিপিচাতুর্য্য রচনা-মাধুর্য্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠকমাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গদ্যে মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৬২ সালে সীতার বনবাস প্রকাশিত হয়। "অনুবাদের ছায়া পড়িলেও ইহাকে একপ্রকার মূলগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের বিষয়গত মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার না হইলেও, ভাব ও ভাষা বিষয়ে তিনিই ঐরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের পথপ্রদর্শক।" তাঁহার সীতার বনবাস দেখিয়া পরবর্ত্তী লেখকেরা রামায়ণাদি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বিষয় ও বস্তু লুণ্ঠন করিয়া 'রামবনবাস', 'রামের বনগমন', 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রভৃতি বহুপুস্তক রচনা করিয়া বিপুল খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। সীতার বনবাস সাহিত্য জগতে ও গৃহস্থের গৃহে এক দুর্ল ভরত্ন। জানকী চরিত্র হিন্দুমহিলার চিরদিনের আদর্শ চরিত্র। সেই জানকী চিত্র বিদ্যাসাগরের অমর-তুলিকা-সাহায্যে বঙ্গভাষায় চিত্রিত হওয়াতে বাঙ্গালার নারীনর সকলেরই পাঠের সুবিধা হইল। সীতার মত স্বামী-ভক্তিপরায়ণা রমণী অন্য কোন জাতির সাহিত্যে দেখা যায় না। মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী, রাজর্ষি জনকের দুলালী কন্যা, চতুর্দ্দশবৎসর বন-বাসের পর গৃহ-প্রত্যাগতা, আসন্নপ্রসবা জানকী—সেই জানকীর চরিত্রগত অপবাদ লোকমুখে শ্রবণমাত্র, রাজা নির্ব্বিচারে তাঁহাকে একেবারে বনবাসে পাঠাইলেন। তখনও কিন্তু সীতার পতিভক্তি অচলা, তখনও সীতা বলিতেছেন—

কল্যাণ বুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জথুর প্রসহ্যঃ॥

* * *

সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্ট দৃষ্টি-
রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রযোগঃ॥

এ সীতার কাহিনী শুধু বিষাদ কাহিনী, শুধু চির নির্ম্মল, চিরপবিত্র ত্যাগের কাহিনী; ইহাতে ভোগের গন্ধ নাই, বিলাসের লেশ নাই। এই অপূর্ব্ব সতীচিত্র মহর্ষি বাল্মিকী তাঁহার অমৃতবর্ষিণী তুলিকা সাহায্যে চিরজীবন্ত করিয়া গিয়াছেন। সীতার চিত্র আজিও বাঙ্গালীর গৃহের আদর্শ স্ত্রীচিত্র। এই চিত্রই আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর অন্তঃপুরকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিয়াছে। বিজাতীয় সভ্যতার বিলাসকলাপূর্ণ স্রোতের ঢেউ বার বার আমাদের অন্তঃপুরে আঘাত করিয়াও আজ পর্য্যন্ত আমাদের এ আদর্শ রমণীচিত্র ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া উক্ত জানকীচিত্রের উপর যে সমস্ত ধূলিকণা সঞ্চিত হইয়াছিল আমাদের শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের পবিত্র ব্যজনে সেই ধূলিরাশি অপসারিত হওয়ায় মা জানকীর 'বহ্নৌ বিশুদ্ধা' পবিত্র মূর্ত্তি প্রত্যেক বাঙ্গালীর চিত্তপটে আবার যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাই আজ আমাদিগের বাঙ্গালীর গৃহের প্রত্যেক মহিলাকে বলছি—এসো মাতা, এসো ভগ্নি, এসো কন্যা,—এসো ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শুদ্ধান্তঃকরণে

একবার এই রাজনন্দিনী, রাজস্নুষা, রাজমহিষী সীতার চিত্রের দিকে তাকাও, ঐ শোন—রাজ্যের পালনকর্ত্তা, নিজ জীবিতেশ্বর কর্ত্তৃক নিবিড় অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হইয়াও, তিনি বলিতেছেন, তিনি তোমাদের শিক্ষা দিতেছেন—

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥

* * *

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

* * *

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

* * *

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥

এইজন্যই পূর্ব্বোক্ত যতীনবাবু সীতার বনবাসকে বিদ্যাসাগরের 'গৌরব নিশান' আখ্যা দিয়াছেন। আবার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন "বিদ্যাসাগর রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে 'কান্নার জোলাপ' কহে।" এখনও অনেকে স্ব স্ব গৃহের মহিলাগণকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'মডেল ভগিনী' বা 'ঘরে বাইরে' পড়িতে না দিয়া 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' সাদরে পাঠ করিতে দিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগরের রচনানৈপুণ্যের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি যে তুলিকা সাহায্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস

প্রভৃতি রচনা করিয়া ভাষার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন· সেই তুলিকা দিয়াই 'বিধবা বিবাহ', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না' প্রভৃতি সামাজিক ও স্মৃতি বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ রচনাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন,—আবার সেই তুলিকা দিয়াই সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি রচনাদ্বারা বালকদিগের জন্য বাঙ্গালা শিক্ষার সোপান চিরদিনের জন্য তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। শুধু বর্ণপরিচয় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভূত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে সাধারণ লোকের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তেমন চর্চ্চা হইত না। তাহার কারণ, তখন শিশুগণের শিক্ষার উপযোগী তেমন ভাল পুস্তকই ছিল না। বর্ণপরিচয় প্রকাশ করাতে লোকের সে অভাব বিদূরিত হইল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বিদ্যাসাগরের রচনায় তাদৃশ মৌলিকতা নাই। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি আংশিকভাবে অনুবাদ হইলেও উহাতে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগরের আরও অনেক গুণ ছিল। তাঁহার অসীম দয়া দেখিয়া সে সময়ে সকলে তাঁহাকে 'দয়ার সাগর' বলিতেন। উপরন্তু বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্যের আর এক বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় বিরাম যতির ব্যবহার ছিল না। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরাম যতির ব্যবহার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন লেখকেরই রচনায় , ; : ! ? প্রভৃতি যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। ইহারও নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ পরিমাণে ঋণী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অন্যান্য সৎকার্য্যের দ্বারা নিজেকে যশস্বী না ও করিতেন, তথাপি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তিনি মৌলিকভাব পূর্ণ পুস্তক অধিক প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু কেবলমাত্র অনুবাদ ও ভাব-সংগ্রহের দ্বারা তিনি বঙ্গভাষাকে এমন পরিমার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেরূপ পারেন নাই, ভবিষ্যতে কেহ পারিবেন কি না সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে। * * প্রকৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি কেবল স্বদেশীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে নহে পরন্তু বিদেশীয় ইংরাজী সাহিত্য হইতেও ভাবসমূহ সগ্রংহ করিয়া বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশীয় সামাজিক কুরীতির বিনাশ মানসে বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

আরও তিনি যে সময় সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, সে সময় বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্ত্তনের সময়। * * * সাধারণ লোকে—এমন কি বিদ্বান লোকেও ইংরাজী শিক্ষার দিকে এতদূর আকৃষ্ট ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তন্নিবন্ধন এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে, তৎকালে পুরাতন সংস্কৃত ভাষা বা মৌলিক বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। * * * তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা লইয়া তিনি শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিলেন; হিন্দি হইতে বেতালপঞ্চবিংশতি ও ইংরাজী হইতে বঙ্গের ইতিহাস, বোধোদয়, ভ্রান্তিবিলাস, কথামালা ইত্যাদি রচিত হইল। * * * হইতে পারে, স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বঙ্গগদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু বর্ত্তমান কালের 'বিদ্যাসাগরী ভাষার'

সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। * * * তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের ঠিক পিতৃসদৃশ না বলিলেও তাঁহাকে ইহার পরিপোষণকর্ত্রী মাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বর্ত্তমান সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল অবস্থা।

প্রায় সকল দেশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে নিপুণ উৎকৃষ্ট লেখক কখন কোন দেশে একা দেখা দেন না। ইংলণ্ডেও Golden age of English Literature ছিল; গ্রীস রোমেও তাই। সংস্কৃতে বিক্রমাদিত্যের সময়ও তাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে, দেখিতে গেলে, বিদ্যাসাগরের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত কালকে Golden age of Bengali Literature বলা যাইতে পারে। কারণ, দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু পরে পরেই অনেকগুলি সাহিত্যরথী বিভিন্ন বিষয় লইয়া বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সাধারণ গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ লইয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, ধর্ম্মমূলক ও ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি, ধর্ম্ম গ্রন্থানুবাদ ও সামাজিক বিদ্রূপাত্মক রচনা লইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লইয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি, প্রত্ন-তত্ত্ব লইয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি, পদ্য-কাব্য, নাটকাদি ও সামাজিক প্রেমাত্মক কবিতাদি লইয়া মাইকেল দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি, ভাষা-তত্ত্ব লইয়া রামগতি ন্যায়রত্ন, গভীরভাব ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্রূপাত্মক সামাজিক সমালোচনা লইয়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি এবং সর্ব্ববিষয়িণী রচনার ডালি লইয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার চরণকমলে অর্চ্চনাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

যেমন কোন রমণীর গাত্রের রং শুধু গৌরবর্ণ হইলে হয় না, চোক মুখের গড়ন ভাল চাই, কাপড়চোপড় চাই, উপরন্তু গা সাজানো অলঙ্কারাদিও চাই;—তবে সে রমণীকে অনিন্দ্যসুন্দরী দেখাইবে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যে সব সাহিত্যিকের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত তিনি সেই বিষয়ক রচনারূপ অলঙ্কারাদি লইয়া বঙ্গভাষা-সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে যথাবিধি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন; ফলেআমরা বঙ্কিমের সময়ে বঙ্গভাষার অনিন্দ্যসুন্দরী মোহিনীমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমরা বিদ্যাসাগরের যুগের উল্লিখিত সাহিত্যসেবিগণের বিষয়ে সংক্ষেপে অনুশীলন করিব।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।(১৮২০-১৮৮৫)—

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম; ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, গীতমঞ্জরী, আত্মজীবন-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ নাটককার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার সুযোগ্য পুত্র। ইঁহার ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত বাঙ্গালা ভাষায় এক মূল্যবান পুস্তক। ইহাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মহারাজ মহাতাব চান্দ (১৮২০-১৮৭৯)—পরম সাহিত্যা-মোদী বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মহাতাব চান্দ বাহাদুর তাঁহার সভাপণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মুখে মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অভিলাষী হন, এবং

অবিলম্বে তজ্জন্য পণ্ডিতমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য এই অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার এই বিরাট সদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। "বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে কেবলমাত্র মহাভারত নহে, হরিবংশ এবং রামায়ণের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর এ কীর্ত্তি এ দেশে চির প্রতিষ্ঠিত রহিবে।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৪)—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—নীতিসার দুইভাগ, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, ভূষণসার নামে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি সোম প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় সুপদ্ধতিক্রমে ও সুরুচি সহকারে সংবাদ পত্র প্রচার-প্রথা ইনি প্রথমে দেখাইয়া দেন।" ‡ সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। * * * 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয়মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই।" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জন্মদাতা। এজন্য এদেশের লোক চিরদিন ইঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন।" ‡

‡ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০–১৮৮৬)—দরিদ্রের সন্তান অক্ষয়কুমার দত্ত বলবতী জ্ঞানপিপাসা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করতঃ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সংসাধন করেন। পরে দেখিব—৺রজনীকান্ত গুপ্তও অক্ষয়কুমারেরই মত দারিদ্র্যের সহিত আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া সাহিত্য পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত চারুপাঠ তিনখানি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শিক্ষার জিনিষ, অক্ষরজ্ঞানের ভাণ্ডার। ভাষা হিসাবে বালকের নিকট জ্ঞানপ্রদ, বিজ্ঞানতত্ত্ব হিসাবে সকলের শিক্ষার জিনিষ। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, গবেষণাকৌশল ও বিচার নৈপুণ্য, তাঁহার রচনাও তদ্রূপ ওজস্বিনী, গাম্ভীর্য্যময়ী ও চিত্তচমৎকারিণী। "তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব্ব ভাবারাশিতে সজ্জিত করিল। তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতি তাঁহাকে যত্নসহকারে আপনার কার্য্যকারণ পরম্পরায় সহিত সুপরিচিত করিয়া দিল; তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিন্তনে অগ্রসর হইলেন, অতীত যেন বর্ত্তমানের ন্যায় সমুজ্জ্বলভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল; তিনি আত্মবিষয়ে উপদেশ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চির-পরিচিত বন্ধুর ন্যায় অবলীলাক্রমে তাঁহার মানসপথে উদিত হইতে লাগিল।" ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, পুরাবৃত্ত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সন্তোষবিধায়িনী রচনা লিখিয়া তিনি পাঠকবর্গের চিত্ত-চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন—"তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয় তখন

শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই—গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিন্যাসচাতুরী ও সর্ব্বোপরি সেই দীপ্তিময় বহ্নিস্তূপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে। * * * অক্ষয়কুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানগুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েরই নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। * * বিজ্ঞানের নিগূঢ়তত্ত্বের নিরূপণ, তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদের মধ্যে পরিগণিত ছিল।"

এক্ষণে বাঙ্গালাভাষায় ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সরল মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ে কতই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে অক্ষয়কুমারই এই ধরণের পুস্তক প্রথমে লেখেন। ইহার প্রথম রচনা বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দুইভাগ; তৎপরে চারুপাঠ তিনভাগ। শেষ জীবনে অক্ষয়বাবু ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুইভাগ উল্লেখযোগ্য; উহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাধীন গবেষণা অনুসন্ধিৎসা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকের মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার সমধিক ভক্তি বা আস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমারের রচনা হইতে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অনাদরের সামগ্রী নয়, ক্ষমতাবান লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তিবিকাশ করিতে পারে। * *

বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বাবু অক্ষয়-কুমার দত্তের সমবেত যত্নে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগে অর্থাৎ গন্তাংশে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছিল।"

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, অক্ষয়কুমারকে পাইয়া বঙ্গভাষা সগর্ব্বে বলিতে পারিতেন—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার,
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার।

শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'বঙ্গবাণী'তে লিখিয়াছেন: "বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই [প্রথম] বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত আদর্শে সুমার্জ্জিত এবং সুগঠিত করিয়া আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২১-১৮৯১)—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি, আই, ই—প্রাকৃতিক ভূগোল, শিল্পিকদর্শন, পত্র কৌমুদী, ব্যাকরণ প্রবেশ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী, রহস্য-সন্দর্ভ ও বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে এক্ষণে এত আগ্রহ, এত যত্ন দেখা যাইতেছে রাজেন্দ্রলাল তাহার পথপ্রদর্শক। প্রত্নতত্ত্বালোচনা বিষয়ে ইনিই অগ্রণী, ইনিই প্রথম উৎসাহদাতা।

কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২-১৮৯২)—কৃষিবিত্তা বিষয়ে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া আদর্শ উত্তান স্থাপন করিয়া ইনি পাশ্চাত্য

প্রণালীতে কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। ইনি বিধবা বিবাহ, কৃষি-বিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদক নিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত ইহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)—মাইকেল মধুসূদন ইনি এইযুগের একজন অসাধারণ প্রতিভাবান লেখক। গদ্যসাহিত্যে যেমন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার নূতন যুগের সৃষ্টি করেন, পদ্যসাহিত্যে সেইরূপ মাইকেলও এক অপূর্ব্ব নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। অবশ্য, ইহার জন্য কবিকে প্রথম প্রথম প্রভূত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কাব্য বা পদ্য-সাহিত্য আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে, মাইকেলের নাম এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিবার দুইটা কারণ আছে ; প্রথম, তিনি যে নব-যুগের সৃষ্টি করেন তাহা শুধু বাঙ্গালা পদ্যসাহিত্যের বা কাব্যের নহে, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের। 'প্রদানিল', 'উত্তরিল', 'মর্ম্মরিল', 'নির্ম্মিল', 'পীড়িল', 'স্বনিল' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করেন। ইহার জন্য তাঁহার উপর চারিদিক হইতে যথেষ্ট শ্লেষোক্তি বর্ষিত হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সে সময় মৌনভাবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। প্রতিভাবান লেখকমাত্রেই কিছু না কিছু নূতনত্ব আমদানি করেন যাহার জন্য তাঁহাকে পরে শ্লেষোক্তিবর্ষণ মাথা পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু প্রতিভাবান লেখক সে শ্লেষোক্তি গ্রাহ্য করেন না। রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট তীব্র শ্লেষোক্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু অধুনা রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আদর্শভাষা হইয়া দাড়াইয়াছে। মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ 'হেক্টর বধ' (১৮৭০) নামে তাঁহার একখানি গদ্যগ্রন্থও ছিল; তবে এখানিতে তাঁহার লেখক বা সাহিত্যিক নামের গৌরব বৃদ্ধি না করিয়া বরং হ্রাস করিয়াছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এ খানিকে একখানি 'সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, 'গদ্য রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগী ছিল না।' তবে ইঁহার নাম বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই নিমিত্ত যে, এই মাইকেল এককালে 'পৃথিবী' শব্দ শুদ্ধভাবে লিখিতে অসমর্থ হইয়া সহাধ্যায়ী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (বাঙ্গালা ভাষার উপর অবজ্ঞাচ্ছলে সাহেবী ঢঙে) বলিয়াছেন 'Oh no, it must be প্র—থি—বী'; এই মাইকেল বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠিলেই সাতিশয় অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল"; আর এই মাইকেল উত্তরকালে এমন 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছিলেন—

'গৌড়জন যাহে
আনন্দে [করিছে] পান সুধা নিরবধি'

আবার এই মাইকেলই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এই সনেট রচনা করিয়াছিলেন—

'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
• • • পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখনি, পূর্ণ মণিজালে।'

এ পরিবর্ত্তন কি অভাবনীয় নয়? পূর্ব্বোক্ত বাবু কুমুদনাথ দাস লিখিয়াছেন—"Before his death, he wrote a Bengali prose translation of Homer's Iliad and a half finished Bengali drama—Mayakanana—which bear marks of a completely spent-up genius. * * * It is in Madhusudan's writings that we first meet with that virile aud all-round influence of the Western Literature upon the Eastern, an influence which has shaped the destiny and guided the tendencies of the Bengali language and has been instrumental in its phenomenally rapid development."

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (১৮২৫-১৮৮৬)—প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী পড়াইতেন এবং তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পরি ভাষায় পাটীগণিত ও বীজগণিত লিখিয়াছিলেন। গণিত বিষয়ক বাঙ্গালা পরি ভাষা ব্যবহারে ইনিই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক। গণিত, জ্যোতিষ এবং ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)—ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি মাইকেলের সহাধ্যায়ী। শিক্ষিত বংশেই ইঁহার জন্ম; বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধা ও দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি সারাজীবন শিক্ষাবিভাগেই অতিবাহিত করেন এবং উত্তরকালে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিনি যৎকালে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ছাত্রদিগের পাঠের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি তৃতীয় অধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি রচনা করেন।

শিক্ষাবিভাগে সারাজীবন কাটাইয়া তিনি যে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' অনুবাদের ছায়া পড়িলেও উহাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে ইতিহাসোক্ত ঘটনার ব্যত্যয় ঘটিলেও উপন্যাস হিসাবে বড় সুন্দর হইয়াছে। যে উপন্যাসরাশি রচনা করিয়া বঙ্কিমবাবু অতুল যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ভূদেবের এই উপন্যাস সেই শ্রেণীর প্রথম উদ্যম হইলেও সফলকাম হইয়াছে—বলিতে হইবে। ইহাতে বর্ণিত দিল্লীর প্রাসাদ, সাজাহানের ময়ূর সিংহাসন, শিবাজীর স্বদেশ-প্রীতি আওরঙ্গজেবের ধূর্ত্ততা, রামদাস স্বামীর শিষ্য-বাৎসল্য, বিশেষতঃ সম্রাট-নন্দিনী রোশীনারার 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' চিত্র—বঙ্কিমের চিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এতদ্ব্যতীত ভূদেব পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে কয়খানি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর সমালোচনা দেখিতে পাই। "সাহিত্য ক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ। তিনি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার, ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনা বৈচিত্র্য পরিস্ফুট

হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্য সংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন ও ভূদেব দুই জনেই হিন্দু সন্তান, দুইজনেই সমসাময়িক, দুইজনেই সহাধ্যায়ী এবং দুইজনেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন; কিন্তু একই শিক্ষার যে একই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে ফলের ইতর বিশেষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধুসূদন যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন; মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ভূদেব তাহার আকর্ষণে স্খলিত পদ হ'ন নাই। মধুসূদন জাতীয়ভাব পদদলিত করিয়াছেন; ভূদেব জাতীয় ভাবের প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। একের প্রতিভা বিজাতীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য, চিরপ্রসিদ্ধ চরিত্রের হীনতা ঘটাইয়াছে; অপরের প্রতিভা স্বদেশের বিশ্বজনীন উদার ভাব নিচয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে।" কুমুদ বাবু বলিয়াছেন He might well be called the Addison of Bengal.

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)—

রাজনারায়ণ বসু মাইকেলের পরম বন্ধু ছিলেন। ইতি ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সেকাল আর একাল, হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, আত্মচরিত, গ্রাম্যোপাখ্যান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার দ্বারা সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্য যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর—কবি বা নাটককার বলিয়া বিশ্রুত

হইলেও, ইহার কিঞ্চিৎ গদ্য রচনাও আছে; সেই স্বল্প গদ্য রচনা হিসাবেই এ প্রবন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল। মাইকেলের গদ্যরচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেও ঠিক তাহা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধু যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর প্রভৃতি গদ্য উপন্যাসগুলি না লিখিলে বোধ হয় ভালই হইত। স্থানে স্থানে উৎকট সমাস ভারে নিপীড়িত তাঁহার গদ্য রচনাগুলি আমরা বিশেষ প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য মনে করি না তবে তিনি সমাজ-সংস্কার কল্পে যে চাবুক উত্তোলিত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তৎকালে মহদুপকার সংসাধিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু খুব রসিক লোক ছিলেন। "তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক খোসগল্প সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেইগুলি পুস্তক মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেরূপ করায় অনেক স্থলেই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই।" ইহার রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার দোষগুণ খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালাভাষায় বিরল।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০-১৮৮৫)—

তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা রচনা করিয়া হেয়ার সাহেবের Prize Fund হইতে পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ১৮৫৪ সালে কাদম্বরী ও ১৮৫৯ সালে রাসেলাস—এই দুই খানি দুই ভাষার অতি কঠিন পুস্তককে—অতি যোগ্যতার সহিত সুললিত বাঙ্গালায় অনূদিত করেন। ইঁহার কাদম্বরী সীতার বনবাসের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শোভাবাজারের বিদ্যোৎসাহী রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরও জনসনের রাসেলাসের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)—

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮), বস্তু বিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগ (১৮৫৯), রোমাবতী (১৮৬২), দময়ন্তী (১৮৬৯), মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ (১৮৭২), রামচরিত (১৮৮১), নীতিপথ (১৮৮২), বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আজকাল দীনেশবাবু প্রমুখ লেখকগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; কিন্তু রামগতির এ গ্রন্থ অনেক আগেকার; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ভাষা ও সাহিত্যামোদিদিগের নিকট ইহা একখানি বড় মূল্যবান পুস্তক; ইহার রচনা-প্রণালীও বিশেষ প্রশংসনীয়। অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইলেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই পুরাতন গ্রন্থ আজিও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পণ্ডিত রামগতির মৃত্যুর পর ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্তগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল, এই পুস্তকের কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া নূতন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন।

যে সময়ে ভারতবর্ষের ভাল ইতিহাসের অভাব দেখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন, ইহার পরে ইনি গোষ্ঠী কথা রচনা করেন। অতঃপর ভূদেব বাবুর উৎসাহে সংস্কৃত মহাবীর চরিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; পুস্তকখানির নাম দেন রামচরিত, এবং ভূদেব বাবুর নামেই উৎসর্গ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিশুপাঠ্য নীতিপথ রচনা করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙ্গালায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন; সেখানির নাম "ইলছোবা" বা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান। পুস্তকখানি উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমের কোন উপন্যাসের সমতুল না হইলেও, ইহার ভাষা "প্রাঞ্জল ও বিশদ"।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক (১৮৩২—?)—ইনি রণজিৎসিংহের জীবনী, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতি লিখিলেও, ব্রহ্মমোহন বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতি শাস্ত্র বিষয়ক অনেক নূতন সুষ্ঠু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—যাহা তাঁহার দ্বারাই প্রথম উদ্ভাবিত হয়।

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)—

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের অগ্রজ; ইঁহার রচনা মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, জালপ্রতাপ চাঁদ, পালামৌ, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী প্রভৃতি। ইঁহার রচনা বঙ্কিমের তুল্য না হইলেও নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩৫-১৮৯০)—

তখনকার দিনে ধনী লোকেরা বিদ্যাশিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ ধনীর সন্তান হইয়াও শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, সাহিত্যামোদীও ছিলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে ও বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং বিদ্বজ্জন মণ্ডলীকে তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের স্বনামধন্য স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব ব্যতিরেকে ইতিপূর্ব্বে কেহ শিক্ষা বিস্তার বিকল্পে

ঈদৃশ বহু অর্থ ব্যয় ও বিপুল কষ্ট স্বীকার করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্নের মহাভারতই মূল সংস্কৃত মহাভারতের সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক অনুবাদ। "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার এ কীর্ত্তি চিরোজ্জল রহিবে!" এতদ্ব্যতিরেকে কালীপ্রসন্নের হুতোম পেঁচার নক্সা তৎকালীন সমাজের একখানি উৎকৃষ্ট নক্সা। ইহার দ্বাদশ গোপাল প্রভৃতি যিনি একবার মাত্র পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সাহিত্য রচনাশক্তির অনুশীলন করিতেছি, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বা অন্য মনোবৃত্তির নহে। ইনি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটক নিজে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিজ বাড়ীতে প্রথম অভিনয় করান। বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৮৯)—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সমুচ্চয়ের যথাযথ বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গ ভাষার পরিপুষ্টি সংসাধন করেন। অধুনা বঙ্গ ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে;—ইনিই তৎসমুদয়ের পথ প্রদর্শক। ইহার চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড—চিকিৎসা বিষয়ে বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ; ইঁহার অন্য রচনা শারীর বিদ্যা, মাতৃশিক্ষা ইত্যাদি। বঙ্গের গৌরব সরস্বতীর বরপুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইঁহারই পুত্র।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০)—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের বক্তৃতা, ৫ ভাগ,

কুসুমাঞ্জলি, চন্দ্রবংশ চন্দ্রালোক, উদ্বাহ চন্দ্রালোক, শুদ্ধি চন্দ্রালোক, শিক্ষা প্রভৃতির রচয়িতা।

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৭-১৯১৭)—চন্দ্রশেখর বসু প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, বেদান্ত প্রবেশ, বেদান্ত দর্শন, সৃষ্টি, অধিকার তত্ত্ব, বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি, হিন্দুধর্মের উপদেশ প্রভৃতির রচয়িতা। বাঙ্গালায় আধ্যাত্মিক বিষয় রচনার জন্য ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ইঁহার সমস্ত পুস্তকই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক। এই সকল গ্রন্থ বিস্তর রাজা, মহারাজা, জমীদার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য ভদ্রলোককে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

হরিমোহন প্রামাণিক (১৮৩৮-১৮৭৩)—

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ শীর্ষক একখানি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)—

বাঙ্গালা ভাষায় কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি ভক্তিরসাপ্লুত। 'বিধান ভারত', "নবসংহিতা", 'জীবন বেদ" 'সেবকের নিবেদন' প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের রচনা; এতদ্ভিন্ন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার' নামক দুইখানি সাময়িক পত্রের ইনি প্রকাশক। ইনি 'অশোক-চরিত' নামে একখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্কিমের সমসাময়িক ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কারিদিগের একজন অগ্রগণ্য।" ‡

‡ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)—

এইবার আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয় অনুশীলন করিব। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের পর সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী,—কবিতা, সাধারণ সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন. পুরাণ, উপন্যাস—এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া বঙ্কিম কিছু না কিছু রচনা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত 'বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "ঈশ্বর গুপ্ত যে গদ্য প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা প্রাণশূন্য, বলশূন্য। তাঁহার কবিতার ন্যায় সে ভাষা আড়ম্বর অনুপ্রাসভারে পীড়িত, শব্দের শৃঙ্খলে বদ্ধ, অপরিস্ফুট, বেগশূন্য। প্রথম অভাব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোচন করিলেন। গদ্যে প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা জন্মিল। আর একদিকে অক্ষয় কুমার দত্ত ভাষার এই গুরুতর অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুইজন লেখক অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু অনুবাদেই তাঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যবসিত হইল। মৃণ্ময়ী প্রতিমা গঠিত

হইল মাত্র; প্রতিমার অলঙ্কার, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সমস্তই অবশিষ্ট রহিল। প্যারীচাঁদ মিত্র কতক পরিমাণে ইহা জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার পর এই উভয় কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত সম্পাদিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। ভাষার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যে মহামূল্য অলঙ্কার পরাইয়াছেন তাহার তুলনা কোথায় হইবে? ব্রাহ্মণ কুলতিলক বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পৌরহিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতর ব্যক্তি কে? বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে বঙ্গসাহিত্যে বিচিত্র বিপ্লব উপস্থিত হইল। সাহিত্যের পল্লী সহসা বিস্তৃত হইয়া সাহিত্যের রাজ্যে পরিণত হইল, দগ্ধ মরুভূমে শীতল সলিলা কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী বহিল। দরিদ্রের কুটীর সহসা ধনধান্য মণিমুক্তা পরিপূর্ণ হইল। সমগ্র শিক্ষিত বঙ্গবাসী সেই অভিনব আনন্দপূর্ণ রাজ্যের প্রজা হইল। সকলে একবাক্যে হর্ষজয়ধ্বনি করিয়া বঙ্কিমের শিরে রাজমুকুট পরাইল। * * তিনি জানিতেন সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, অযোগ্য ব্যক্তির ক্রীড়া কৌতুকের নহে। ভাবের, ভাষার উৎস মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং প্রহরী হইয়া দাঁড়াইলেন; পাছে কেহ সেই নির্ম্মল সলিল আবিল করে। সেই সলিলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ উৎপাদিত করিল। বঙ্গবাসী বিস্মিত, মুগ্ধ, আনন্দিত হইয়া সেই প্রবাহ এবং সেই বর্ণ বৈচিত্র্য দর্শন করিতে লাগিল।

বঙ্গ ভাষার স্তরে স্তরে যে রূপরাশি এতদিন লুক্কায়িত ছিল বঙ্কিম একে একে তাহা উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন। ভাবের অভাবে যে ভাষা মৃতপ্রায় ছিল ভাব প্রাচুর্য্যে তাহা সৌভাগ্যশালিনী হইয়া উঠিল।

যে ভাষা নিরর্থ শব্দভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল সেই ভাষা ছন্দোময়ী, আবেগময়ী হইয়া উঠিল। মহামহিমাময়ী প্রতিভা, অপূর্ব্বসৃষ্টি-কুশলী কল্পনা বঙ্গভাষার অভাব মোচনে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নিযুক্ত হইল। মহাশক্তিশালী ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে ভাষায় মোহমন্ত্র বিরচিত হইল। যেমন বেগ তেমনি সংযম, যেমন তীব্রতা তেমনি কোমলতা, যেমন মাধুর্য্য তেমনই গাম্ভীর্য্য। কে জানিত এই সঙ্কীর্ণ দরিদ্র ভাষায় এত বল এত বৈচিত্র্য ছিল! পল্বলের গোস্পদের স্থায় সঙ্কীর্ণভাষা সমুদ্রগামিনী পূর্ণ প্রবাহিণীর স্থায় সহস্রমুখী হইয়া নানাতরঙ্গভঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়ের নির্জ্জন প্রদেশে কোথায় একতারা বাজিতেছিল, সহসা একেবারে সপ্তস্বরা বীণা বাজিয়া উঠিল। * * এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা বঙ্কিমের লেখনীর মুখে শাণিত অসির তীক্ষ্ণতা, বজ্রবিদ্যুতের বলধারণ করিয়াছে। তর্কে, সমালোচনায়, এই তীব্র তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। একমুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া পুরাকালে সমরাচার্য্য যেরূপে শত্রু নিবারণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপে সংক্ষেপে অবলীলাক্রমে সাহিত্যসাধনক্ষেত্র হইতে ভণ্ড অক্ষমকে খেদাইয়া দিতেন। তাঁহার হস্তে ব্যঙ্গ বজ্র হইয়া উঠিত।" ‡

তিনি আরও বলিয়াছেন "প্রতিভা কিরূপ বলবতী হইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোমলতা গভীরতা তন্ময়তা বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন বলবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বলে বঙ্কিম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে চরিত্র গঠনে অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে এই বল সর্ব্বত্র

‡ ভারতী—আষাঢ়, ১৩০১

জাগিয়া রহিয়াছে। এই বলে তাঁহার করুণা এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রেম এত বলবান, পরোপকার এরূপ সর্ব্বত্যাগী। এইজন্ত কোনস্থানে তাঁহার রসভঙ্গ হয় নাই, কুত্রাপি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই। মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে সুরে বাঁধা থাকিত, যখন যে তারে অভ্রান্ত সিদ্ধ হস্তে আঘাত করিতেন, সেইরূপ প্রতিশব্দ হইত। এই জীবনব্যাপী সাধনা ও একাগ্রতায় তিনি কদাপি আত্মবিস্মৃত হন নাই, মুহূর্ত্তের জন্ত তাঁহার বলদৃপ্ত প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নাই। আড়ম্বরের লেশ নাই, ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা আছে। ভাবে, যুক্তিতে, রসিকতায়, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্র আদর্শ মিলন। কোথাও আয়াস নাই, অঙ্গভঙ্গী নাই, নীরস চপলতা নাই। শব্দ বিন্যাসের অন্ধকার ঘনঘটা কোথাও নাই শ্রুতি মধুর শব্দপ্রবাহ, নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল কারুকার্য্য সর্ব্বত্র আছে। নিরবচ্ছিন্ন অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষা, অথচ শব্দলালিত্যের নিমিত্ত ভাব-গৌরব কোথাও বিনষ্ট হয় নাই। স্মরণ করিতে হইবে যে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ। কিঞ্চিৎ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যদি বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে ভাষার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। কিন্তু ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা, সর্ব্বোপযোগীতা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রত। কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সমা-লোচনায়, কূটপ্রবন্ধে, বিশুদ্ধ রহস্যে; ধর্ম্মের গভীর আলোচনায় তিনি এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা পরিচালিত করিলেন—দেখাইলেন কোথাও অসামঞ্জস্য নাই, ভাষার কোন অভাব নাই। সর্ব্বত্র তিনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র অবিশ্রান্ত অপরিসীম বলবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। * * *

বঙ্কিম যখন সাহিত্যে প্রথম আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন রসিকতার নামান্তর গালি ছিল। ইতর অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়াকে লোকে কৌতুক বিবেচনা করিত। ঈশ্বরগুপ্ত ও গুড়গুড়ে যখন অশ্রাব্য ভাষায় ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন তখন লোকে আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইত। উচ্চশিক্ষার ফলে, উচ্চ আদর্শের গুণে, নির্ম্মল প্রতিভার বলে, সে দোষ বঙ্কিমকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকের গায়ে কাদা ছিটাইয়া তিনি কখন লোক হাসান নাই। বিশুদ্ধ রসিকতা প্রতিভার অতি উচ্চ অঙ্গ। বঙ্কিম পূর্ণমাত্রায় তাহা পাইয়াছিলেন। নির্ম্মল হাস্য কৌতুক পরিহাসের আদর্শ তিনি বঙ্গসাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে রসিকতা অতি গভীর, অতি বিশুদ্ধ, যে হাসির গভীর তলদেশে অশ্রুজল লুকায়িত থাকে বঙ্কিম স্বজাতিকে তাহাই দিয়া গিয়াছেন।"

বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য-পরিচর্য্যা বিশ্লেষণ কালে বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্ক মোহন সেন লিখিয়াছেন; "বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্যকে নিখুঁত আর্য্য-আদর্শে সংস্কৃতের অনুগত করিয়া যান। * * বঙ্কিমের প্রতিভাই অনুপম স্বভাব শীলতা এবং স্বাধীনতার গুণে, একদিকে বিদ্যাসাগর এবং অন্যদিকে প্যারীচাঁদ প্রভৃতির মধ্যপথে, প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। * *

উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। তাই বা কেন, তিনি বঙ্গদেশে এই এক নবসাহিত্য-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কপালকুণ্ডলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিভার যেই মেঘ গর্জ্জন দূর হইতে শুনা গিয়াছে, চন্দ্রশেখর বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহাই ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী

গৃহস্থের গৃহদ্বারে আসিয়া তাহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত করিয়াছে। বাঙ্গালী এই ধ্বনি ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই। *

বঙ্গীয় কথাসাহিত্যে এবং গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চির-পূজ্য আসন; * * যথোচিত ঘটনা এবং চরিত্রের সৃষ্টি, উপাখ্যানের নৈতিক ভিত্তি, ভাষার শাণিত দীপ্তি, ত্বরিত গতি এবং সর্ব্বত্র হৃদয় গ্রাহিতার গুণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী; তাঁহার ভাষা ভাব ও বস্তুবিষয় সর্ব্বত্র সুমার্জ্জিত এবং সংযত; * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিক ইংরাজী বা ইয়োরোপীয় উপন্যাসের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রকাণ্ডতা নাই; মনুষ্য জীবনের সর্ব্ববিধ ভাল-মন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে ওজস্বী কিংবা বৈচিত্র্যময় চরিত্র সমাবেশ নাই। তাঁহার উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র; বর্ণিত চরিত্র গুলিও বড় প্রকাণ্ড নহে; এবং মানব জীবনের এক একটা সরল এবং ব্যাপক ভাবকে আশ্রয় করিয়াই উহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। * * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলি এক একটা প্রেমের খেলা; দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ অথবা ব্যভিচারই প্রায় তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড। বঙ্গদেশে গার্হস্থ্য জীবন ভিন্ন জীবন; এবং গার্হস্থ্য প্রেম ব্যতীত মহত্তর বা ব্যাপকতর ভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদের সময় হইতে বাঙ্গালী এই প্রেম লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আসিতেছে; প্রেমের বিষয়েই বাঙ্গালীর প্রতিভা বিশেষ ফুটিয়াছে। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—এই বাক্য আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি, এবং অন্যকে বুঝাইতেছি। আবার, এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমধিক বিকশিত হইয়াছিল। * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলির প্রধান গুণ এই যে, উহারা রচনার বস্তুভিত্তি, গভীর আন্তরিকতা এবং সর্ব্বত্র ঋজুতার দরুণ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বঙ্কিমের রচনা প্রণালীর মধ্যেও কোনরূপ একদেশিতা বা সঙ্কীর্ণতা নাই, উহা সর্ব্বত্র আত্ম-সংযত এবং আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। * *

এই দেশের পরিবার, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইতিহাস এবং ধর্ম্ম আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বঙ্কিমের উপন্যাস এবং সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিভা এবং বঙ্গদর্শনের আহ্বান অনেক বিশিষ্টকর্ম্মা ব্যক্তিকেই প্রলুব্ধ করিয়াছিল। * * *

বঙ্কিম শেষ বয়সের উপন্যাসাদিতে এবং ধর্ম্মতত্ত্বে, দেশের বহু প্রচলিত 'একান্ত বৈরাগ্য' এবং 'সংন্যাসের' আদর্শকে বিপ্রতিপন্ন করিয়া, গীতোক্ত 'ভাগবতধর্ম্ম' এবং সেশ্বর ভক্তি আদর্শের প্রচার করিয়াছেন।"

শশাঙ্কমোহন সেন আরও লিখিয়াছেন: "রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার পদ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ওই পদ-গৌরবে বঙ্গভাষা যথেচ্ছ ভাবে চলিতে পারিতে ছিল না; * * * বঙ্কিমচন্দ্রের কথা হাসিতে, নাচিতে, ছুটিতে, কাঁদিতে জানিত; প্রেম করিতে, কলহ করিতে, যুদ্ধ করিতে জানিত; ঘৃণা করিতে, আঁস্ফালন করিতে, ভীত ও বিস্মিত শান্ত এবং স্তিমিত হইতেও জানিত; * * রামমোহন তর্ক করিতে, নিরস্ত করিতে, ধ্যানস্থ করিতে জানিতেন; কেশবচন্দ্র উদ্দীপ্ত করিতে, অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন; বিদ্যাসাগর বুঝাইতে, কাঁদাইতে জানিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইতে, দীনবন্ধু হাসাইতে জানিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র ন্যূনাধিক সমস্ত এবং তাহারও অধিক জানিতেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ গঠিত—পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে

কোন অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব, অর্থ ও ছন্দ পরস্পকে ব্যভিচরিত করে না বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধ এই সরস্বতী শ্রেষ্ঠ—কাব্যশিল্পীর উপযুক্ত। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমের আবশ্যক ছিল। * * *

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় শিল্পী; আমাদের পরম আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি কেবল ইয়োরোপীয় উপন্যাসাদর্শের অনুকরণ করিতে যান নাই। স্বকীয় অন্তঃকরণতত্ত্বের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবশে, কতকটা জাগ্রতভাবেই তিনি ইয়োরোপীয় সংশ্রব যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রণয়পূর্ব্বক বিবাহের প্রতিষ্ঠা নাই—প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দীতেও, তাই বঙ্কিম একান্তভাবে প্রণয় পূর্ব্বতার অবতারণা করেন নাই। আবার, ভারতবর্ষীয় দাম্পত্য আদর্শে পরিণয় কেবল চুক্তি নহে; এই আদর্শে ব্যভিচার করিয়া দম্পতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিশেষে পুনর্ম্মিলিত হইতে পারেন না! দাম্পত্য তন্ত্রে, যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগে না। রাণী ভবানী সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন—'স্ত্রীলোকের সতীত্ব মৃৎপাত্রের ন্যায়, ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগেনা'; জুড়িয়া দিলেও, রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্ত্তিনীর' মত সেই অতীত পাপছায়া দম্পতির মিলন মধ্যস্থলে জাগিয়া থাকে। এই তত্ত্ব নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইতে পারে; কিন্তু ইহা অধ্যাত্ম জীবনের চিরন্তন সত্য। উহাকে উপেক্ষা করার যো নাই। * *

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, শ্রেষ্ঠ পারিবারিক উপন্যাস। উহার পরিসর ক্ষেত্র ক্ষুদ্র, একটীমাত্র বঙ্গীয় পরিবার। * * কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। উহা বঙ্গসাহিত্যে

অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইংরাজি সাহিত্যেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। দাম্পত্য প্রেমের এই পরম সূক্ষ্ম আদর্শ প্রাচ্য ঋষির আবিষ্কার। * *

আনন্দমঠ গ্রন্থে স্বদেশ-প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্ম সমঞ্জসিত আদর্শ অন্বেষণ করিয়াছে। আনন্দমঠ রচনার সময় বঙ্কিমের বয়স ৪৩ বৎসর। স্বকীয় শিল্প-প্রতিভার সুবর্ণ-সুযোগের চরম রেখা তিনি অতিক্রম করিতেছিলেন। * * বঙ্কিম একদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম সংন্যাসের মধ্যেই দেশানুরাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্যদিকে, ভারতবর্ষীয় সংযম-নিষ্ঠা, উন্নত জীবন সাধনা এবং দম্পতির পরস্পর-প্রাণতার স্থির আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। * *

বঙ্কিমচন্দ্র জগতের মঙ্গলকামী দার্শনিক বলিয়া তাঁহার শিল্পশক্তি সচেতন ভাবেই সমাজের মঙ্গল মুখী। * * *

বঙ্কিমচন্দ্র কবি; গদ্যের ক্ষেত্রে লেখনী পরিচালন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার রচনায় কবিত্ব শক্তি—কল্পনী, দাপনী ও রসনী শক্তি—অসাধারণ! তাঁহার ভাষা এবং রচনারীতি সর্ব্বত্র ঋজু, সংযত, সংহত অথচ ভাবার্থের প্রকাশে ত্বরিতশক্তিমতী; প্রচলিত অথচ গৌরবান্বিত; অমায়িক অথচ গভীর! তাঁহার গদ্যপ্রবাহে সময় সময় ভাবোচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের সুর পাওয়া যায়; অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা, এই গদ্য! * *

এখন যাহারা সরস্বতীর অন্তঃপুরে 'উকি দিয়া' দেখিবার সৌভাগ্যও পায় নাই, তাহারাও বিশত্রিশ খানি তিন বলুম নবেল লিখিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অর্থ অর্জ্জন করিয়া যাইতেছে অবশ্য সারস্বতী খ্যাতি কিংবা শিল্পীর 'পরমার্থ' নহে। এইরূপ এক একটী নবেলের পাঠ শেষ করিয়া, চিন্তা করিলেই দেখিবেন—হয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পরম নিবিষ্ট ভাবেই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হইয়াছিল; উহা যেন কয়েক

ঘণ্টাকাল মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবৎ আবিষ্ট রাখিয়া ছিল! কিন্তু উহার মধ্যে এমন একটা শব্দ, একটি পংক্তি, একটা দৃশ্য নাই, যাহা মনে মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে! সমস্ত গ্রন্থ একটি ক্ষণ প্রদীপ্ত উল্কা-জ্বালার মতইইন্দ্রিয়-পথে বিস্ফুরিত হইয়া নিবিয়া গিয়াছে! * ঐ গ্রন্থের কিছুমাত্র সারস্বত আকর্ষণ নাই; * * উহা 'মস্তিষ্কের অহিফেন' ব্যতীত আর কিছুই নহে। * *

ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকৃত কবিত্বশক্তি লইয়াই উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ গল্প কথকের ন্যায় কেবল ভূয়োদর্শন, পুঞ্জীকরণ বা আমোদনের প্রণালীই তাঁহার শরণ্য ছিলনা। * * চরিত্র-সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। * * বঙ্কিমচন্দ্রও কবিগুণধর শিল্পী। * * শিল্পী মাত্রেরই প্রধান গুণ—সৃজন ও দর্শন শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পূর্ণ ভাবে রহিয়াছে; বঙ্কিম কাব্য লিখিতে যান নাই—গল্প লিখিতে গিয়াছেন; এবং এই গল্পেই তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। * * বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব সামর্থ্য অসাধারণ; * বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি আমাদের সাহিত্যে অনন্য সাধারণ। সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সত্যের দর্শন, অনুরূপ চরিত্র সংঘটনার বিষয়ে বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে একক।"

বাবু রজনী কান্ত সেন তাঁহার বঙ্কিম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "বঙ্কিম চন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনা প্রণালীর যে ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই ত্রুটীর সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। * * তাঁহার (টেকচাঁদের) রচনার ভাব-গ্রহণে যেরূপ কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ সরল শব্দযোজনার গুণে উহা পাঠকেরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না। * * বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর ও অক্ষয়কুমার রচনাগত গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। টেকচাঁদ

ঠাকুর ভাষার এই স্তর হইতে অতি নিম্ন স্তরে গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের এই উভয় স্তরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ব্যোমযান বিহারী আকাশ পথে উত্থিত হইলেও, বায়ুমণ্ডলের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। বায়ুপ্রবাহে যে স্তরে থাকিলে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অব্যাহত থাকে, জীবনী-শক্তির অপচয় না ঘটে, তিনি ততদূর উঠিয়াই, আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উত্থিত হইলেও জীবনী-শক্তি বিসর্জ্জন দেয় নাই।"

বঙ্কিমের রচনাকালকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, পাঠকের মনোরঞ্জন ও পাঠক সংগ্রহ,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতির দ্বারা। এই সকল গ্রন্থদ্বারা পাঠক সংগ্রহ করতঃ তিনি ক্রমশঃ তাঁহার উদ্দেশ্যর সীমা বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করিলেন। দ্বিতীয়ে, তিনি উপন্যাসচ্ছলে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষদান ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, রাজসিংহ, রজনী প্রভৃতি রচনা করেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরে তৃতীয়ে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করতঃ পাঠক পাঠিকাগণকে সমগ্রজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এই শ্রেণীর রচনা। উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, লোক রহস্য, কমলা কান্তের দপ্তর প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল। প্রাচীন বয়সে বঙ্কিম ধর্ম্ম-চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস কেবল ধর্ম্মমূলক ছিল না। অসামান্য যুক্তি কৌশলে তিনি বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন প্রথমে পাঠকবর্গের নিকট, সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীও প্রথমে পাঠকবর্গের নিকট সম্যগরূপে আদৃত হয় নাই। তখন কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে পাঠকের কদর্য্য রুচির খাদ্য সরবরাহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিতেন পাঠকের রুচি উন্নত করিতে; তিনি চাহিতেন 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য।' যুগ সাহিত্যের স্রোতে বা তৎকালে প্রচলিত পাঠকবর্গের রুচির স্রোতে তিনি তাঁহার রচনাবলীর গা ঢালিয়া দিতে সম্মত ছিলেন না। রুচি মার্জ্জিত করা, সমাজ সমুন্নত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাষার পরিপুষ্টি-সংসাধন ও তৎসঙ্গে পাঠক মণ্ডলীকে সৎপরামর্শদান ও তাহাদের সমক্ষে সদ্দৃষ্টান্ত সমুপস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ব্রত।

বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। * * সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

* * আমাদের মধ্যে যাহারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একতারে

বাঁধা ছিল, কেবল সহজসুরে ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে একএকটী করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

* * বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী প্রথমে পাঠক-বর্গের নিকট সমধিক আদর লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্কিমকে চিনিতে বা বঙ্কিমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পাঠক বর্গের অধিকদিন বিলম্ব হয় নাই। পাঠকবর্গের মনোরূপ ক্ষেত্র তখন বেশ উর্ব্বরই ছিল তাহার উপর বঙ্কিমের রচনারূপ বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল বটে; কিন্তু অঙ্কুরিত হওয়ার পর হইতেই সত্বর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শাখা বিস্তার পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"বর্ত্তমান কালের বঙ্গসাহিত্যকে একটী শস্যক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ইহা সংস্কৃত-বাঙ্গালারূপ লতাগুল্মাদি দ্বারা পরিপূর্ণ প্রান্তরের ন্যায় ছিল। রামমোহন

সেই কণ্টকপরিপূর্ণ প্রান্তর হইতে লতাগুল্মাদি উৎপাটন করিয়া, পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলেন অর্থাৎ তাঁহার দ্বারাই বঙ্গগদ্য সাহিত্যের ভিত্তি সৃষ্টি হইল। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই অনুর্ব্বর ভূমিকে পরিশ্রমের সহিত কর্ষণ করিলেন, বিদেশজাত ফলফুলের বীজাদি সংগ্রহ করিয়া সুন্দর রূপে বপন করিলেন, ভূমিতে ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যরূপ সারদিতে ভুলিলেন না এবং সেই বঙ্গসাহিত্য বীজগুলি যাহাতে 'ঈত্যা'দির দ্বারা না নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাঁহার পর অক্ষয়কুমার নীতিরূপ জল হইয়া, সেই সুকুমার বঙ্গসাহিত্য চারাবৃক্ষগুলির মূলদেশে সেচন করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য বৃক্ষগুলি বড় হইয়া ফলভারাবনত হইয়া পড়িল; সেই বৃক্ষগুলিতে দুইপ্রকার সুমিষ্ট ফল ফলিল। একপ্রকার ফল লইয়া মাইকেল হেমচন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধারণ লোকদিগকে কবিত্বের আস্বাদ দিলেন, অপর দিকে প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গণ অন্যপ্রকার ফল লইয়া লোকদিগকে উপন্যাসের আস্বাদ দিলেন। লোকে এই দুই প্রকার ফল খাইয়া, পরিতৃপ্ত হইয়া বৃক্ষের বপনকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং যাহাতে সাহিত্যবৃক্ষে তদ্রূপ আরও উপন্যাস ও কবিতাফল জন্মায় সেইরূপ পরিশ্রম করিতে লাগিল।

• • বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে বহু পরিশ্রমের সহিত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে পর, আধুনিক বঙ্গলেখকগণ তাহার উন্নতি-চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মাইকেল, বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্য সেবকগণ বঙ্গসাহিত্যের শোভা বিস্তার করাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উদ্ধার

সাধন না করিলে, তাহাকে নূতন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে না ধরিলে, বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইত কি না সন্দেহ; এ সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনের পর হইতেই এত কৃতবিদ্য বঙ্গলেখক দৃষ্ট হইতেছে; উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত উপাধিধারী বঙ্গবাসীগণ এবং সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতেছেন, অর্থাৎ প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ইংরাজি সাহিত্যপুস্তক সমূহ হইতে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতেছেন; এবং শেষোক্ত দল স্বদেশীয় মনীষাসম্পন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদি হইতে লুপ্তপ্রায় রত্নাদি উদ্ধার করিয়া বঙ্গসাহিত্যাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন। আর একটি কথা এই, যে বর্ত্তমান কালে যে কোন ব্যক্তি জীবনচরিত, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি বা নীতি গ্রন্থাদি বা অন্য কোন প্রকার ভাবপরিপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করুন না কেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুসরণ করিতে হইবেই। * * *

সেইজন্য ইহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন কালে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে এত উন্নতি তাহার আদি কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। আজকাল যে এমন সুশ্রাব্য ও সুমিষ্ট বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, বিদ্যাসার মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল। তাঁহার এক এক খানি অনুবাদগ্রন্থ এক একখানি মূল গ্রন্থাপেক্ষাও মূল্যবান। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা হইতে কি প্রকার সরল বঙ্গানুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার পথ প্রদর্শক; তিনি মাসিক পত্রিকাদির লিখন প্রণালীর পথ প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যচর্চ্চা প্রবল করাইয়া গিয়াছেন ও ব্যাকরণাদি প্রণয়ন করিয়া

সংস্কৃত শিক্ষার উপায় দেখাইয়া দিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিপথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বঙ্গগদ্য সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, যতকাল বাঙ্গালা ভাষা আদৃত হইবে, যতকাল লোকে বঙ্গ গদ্যের প্রশংসা করিবে, ততকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সমগ্র সাহিত্যজগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

আজ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশ কাঁদাইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে অনাথা করিয়া, জগৎকে শোকসাগরে ডুবাইয়া অনন্তকাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বর্ণপরিচয় হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থ গুলিতে তাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে; যতকাল লোকে বাঙ্গালা কথা কহিবে বা বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিবে, ততকাল লোকে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সম্প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে ভবিষ্যৎকালে বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃত বা ইংরাজি সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া, তাহাদিগের ন্যায়, জগৎপ্রসিদ্ধ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন সাহিত্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র আত্মাকে অভিবাদন করিয়া বলিবে 'আমি আপনার নিকট চিরজীবন ঋণী, আপনি আমার বিপদে রক্ষাকর্ত্তা ও পিতৃসদৃশ পালন কর্ত্তা।'

ঈশ্বরচন্দ্র এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, বঙ্গ-সাহিত্য জগতে চিরকাল অবিনশ্বর রহিবেন"

• ভারতী—মাঘ, ১৩০১

জীবদ্দশায় নিজরচনার সম্যগ্ আদর দেখিতে পাওয়া, অথবা উচ্চ অঙ্গের রচনাদ্বারা-বিপুল সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া, অতি অল্প লেখকেরই ভাগ্যে ঘটে। বিলাতে স্যর ওয়াল্‌টর স্কট, লর্ড বাইরন প্রভৃতি এবং আমাদিগের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশ সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কেবল সাহিত্য রচনা দ্বারায় বিপুল যশঃ ও প্রভূত সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব বর্ণনালালিত্য থাকিলেও সৃষ্টি কৌশল তদনুরূপ নহে; তাঁহার তিনখানি নাটকের গল্পাংশ প্রায় এক; কিন্তু ইংলণ্ডের মহাকবি শেক্ষপীয়রের যেমন বর্ণনা-বৈচিত্র্য তেমনি সৃষ্টি কৌশল। আমাদিগের বঙ্কিমচন্দ্রেরও সৃষ্টি কৌশল যথেষ্ট। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন—কিন্তু কোনটীরই গল্পাংশ অন্য কোনটীর সহিত মিলে না। বঙ্কিমের সৃষ্টিকৌশল যথার্থই প্রশংসনীয়। এক দুর্গেশনন্দিনীতেই আমরা তিনটী তিনপ্রকার অপূর্ব্ব নারী চিত্র দেখিতে পাই। আয়েষা কবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি—যেন মানসী প্রতিমা। "স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।" গল্পাংশে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী স্কটের আইভ্যানহোর সঙ্গে স্থূলভাবে মিলিলেও ইহাতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব, বঙ্কিমের মৌলিকতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা hat, coat, gown বা helmet, gauntletএর কোন চিহ্নও দেখিতে পাই না; জগৎ সিংহ ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ duel tournament-এর অনুকরণ মনে হইলেও—তাহা মনে করা অন্যায়। সংস্কৃত নাটকাদিতেও দ্বৈরত সমরের বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, ইহাতে ইংরেজির গন্ধ মাত্র দেখিতে পাই না; আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কথায় বার্ত্তায়—সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে

বাঙ্গালী ধরণের। আবার অনেকে বলেন বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে Ivanhoe মোটেই পড়েন নাই। তাঁহাদের মত সমর্থন কল্পে তাঁহারা অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস লইয়াও এই বিভ্রাট দেখিতে পাই।

অধুনা বঙ্কিমের অনুশীলন এত অধিক হইয়াছে যে তৎসমুদয় একত্র করিলে একখানি স্বতন্ত্র বিপুলকায় গ্রন্থ হইতে পারে। অধ্যাপক স্বর্গীয় ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন) তাঁহার নিজের অননুকরণীয় ভাষায় অতি সুন্দররূপে নিরপেক্ষভাবে ধারাবাহিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃতানুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুশীলন যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন আরও অনেকেই করিয়াছেন। রায় সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিতকে তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা হারাণবাবুর 'বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—"বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। * * বঙ্কিমের প্রাণময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা পড়িতে পড়িতে এক একবার আমার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি কবিতা পড়িতেছি। * * বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হিসাবে ভাষার জন্মদাতা ও গুরু বটেন,—ভাষাও তাঁহার খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাঁহার ভাষাতেও যেন কেমন বিনাইয়া বিনাইয়া, শ্রোতৃবৃন্দের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। * *

এক্ষণে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা শ্রেণীর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস; জীবন বৃত্তান্ত, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েইকোন না কোন গ্রন্থ দেখা যাইতেছে,—ইহার মূল বঙ্কিম। বঙ্কিমই প্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচলিত করিয়া,—রাজার

দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজ যে, এখন বাংলা সাহিত্যের একটু খোঁজ খবর রাখেন,—ইহার মূলেও বঙ্কিম। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি বাঙ্গালা সাহিত্য একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ইহার এরূপ পুষ্টি ও প্রচার কথনই সম্ভবপর হইত না। * * বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে না নামিলে,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা না করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্য আজ কখনই রাজা প্রজা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না; * * * সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়,—বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞ,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ * * *

বঙ্কিম প্রতিভাবান কবি; তাই তিনি ভাব ও চিন্তার আদর্শে ভাষা গঠিত করিয়াছিলেন,—ভাষার আদর্শে ভাব বা চিন্তা ব্যক্ত করেন নাই। কেবল কাণে মিষ্ট লাগিবার জন্যই যে, তিনি স্থান বিশেষে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেন তাহা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে ভাষা সহজে ও শীঘ্র লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে—যেটি একটী জীবন্ত মূর্ত্তির মত পাঠকের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, সেই ভাষাই অধিক ফলদায়িকা। এই জন্য সাধু শুধু সংস্কৃত মূলক ভাষা অপেক্ষা চলিত অথচ কবিত্বময়ী বাঙ্গালা ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং কাব্যে তাহার প্রাধান্যও দিতেন।

* * * কেবলমাত্র উপন্যাসের দিক হইতে দেখিলে একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি,—কি ভাব, কি ভাষা, কি বর্ণনা, কি চরিত্র-চিত্র, কি রচনানৈপুণ্য, কি লিপিকুশলতা, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, কি ঘটনাসামঞ্জস্য, কি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত,—সকল বিষয়েই আমাদের বঙ্কিম, উপন্যাস জগতে **রাজ রাজেশ্বর**।"

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কারে ফেলে কারে রাখি'—নির্ণয় করা কঠিন। অনেকের মতে বিষবৃক্ষ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আবার হারাণচন্দ্র রক্ষিত বলিয়াছেন "বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতেন। অপিচ, লিপিকুশলতা, চরিত্রচিত্র, ভাষার পারিপাট্য, সূক্ষ্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার একথা ঠিক বটে।" হারাণবাবুর নিজের মতে "কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং এই কপালকুণ্ডলাই কাব্যাংশে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ, ইহা বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নহে। কাব্যের যাহা চরম লক্ষ্য,—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি,—অত্যুন্নত, উদার, অনন্ত, অপূর্ব্ব সুখ-কল্পনা-প্রসূত স্বপ্নময়ী সৃষ্টি,—তাহা এই প্রকৃতিপালিতা, সরলা স্বভাব-সুন্দরীর চরিত্রচিত্রে প্রস্ফুটিত। * * মিরন্দা দ্বীপবাসিনী হইলেও পিতাকে জানিত, পিতার স্নেহ পাইত, সংসারী জীবের সুখ দুঃখের মাত্রা বুঝিত।—শকুন্তলা নির্জ্জন তপোবনে পরিবর্দ্ধিতা হইলেও ঋষিকুমারী-গণের নিকট প্রায় সাংসারিক সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছিল।—কিন্তু এ, কি এ! এ যে বজ্রকঠোর-দৃঢ়তার পার্শ্বে প্রস্ফুটিত কমলিনী! তান্ত্রিকের তান্ত্রিক মূর্ত্তিমান কাপালিকের পার্শ্বে স্নেহ-মমতা-সরলতাময়ী ক্ষুদ্র বালিকা! 'কপাল কুণ্ডলা' বঙ্কিমের চরম সৃষ্টি,—উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পার্শ্বে বঙ্কিমের অন্যান্য সৃষ্টি ধরিলে ম্লান ও মলিন হইয়া যায়। শুধু কাব্যাংশে কেন,—নাট্যাংশেও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি! * * * এই কপালকুণ্ডলাতেই বঙ্কিম অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"

স্বদেশভক্তি ও জাতীয়তা বঙ্কিমচরিত্রে অনুশীলনের আর একটা জিনিষ। তিনি সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা লক্ষ্য করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন "জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয়-কীর্ত্তি। তিনি মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন; বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী ছিল। একাধারে তিনি কবি, উপন্যাস-কার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় বাঙ্গালা ভাষার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞান বিস্তার না হইলে, কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না এবং কোন জাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার করিয়া স্বজাতিকে অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। * * * যিনি স্বদেশীয়দিগকে এইরূপে জ্ঞান সম্পন্ন করিয়া পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত, মহাজাতির মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিয়া অসামান্য কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার এত গৌরব, এই জন্য তাঁহার এত সম্মান।"

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের লেখকগণের রচনার সংক্ষিপ্তানু-শীলন করিব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৩) ইনি একজন বঙ্কিমের সমসাময়িক লেখক; ইনি চিকিৎসা বিষয়ক অনেক পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। শরীর পালন, ধাত্রী শিক্ষা, সরল জ্বর চিকিৎসা

(তিন খণ্ড), বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি শিক্ষা, রোগ বিচার, চিকিৎসা উদ্ভিদবিচার প্রভৃতি ইঁহার রচনা। ইঁহার চিকিৎসাকল্পদ্রুম সে সময়ের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।

কালীময় ঘটক (১৮৪০-১৯০০) : কালীময় ঘটকের গদ্য রচনার মধ্যে চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ তৎকালের বালকদিগের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। ইঁহার অন্য গদ্য গ্রন্থের মধ্যে ছিন্ন মস্তা, শর্ব্বাণী, কৃষি শিক্ষা, কৃষি প্রবেশ, সুরেন্দ্র জীবনী উল্লেখ যোগ্য।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৪০) : সঙ্গীত শাস্ত্রে সৌরীন্দ্রমোহন দিগ্বিজয়ী বীর; সঙ্গীতের জন্য জগতে তাঁহার অতুল সম্মান। পৃথিবীর এমন দেশ, এমন রাজ্য নাই, যেখান হইতে তিনি উপাধি বা পারিতোষিক না পাইয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন : সঙ্গীত সার, জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, মৃদঙ্গ মঞ্জরী, একতান, হারমোনিয়া সূত্র, হিন্দু সঙ্গীত যন্ত্রবোধ প্রভৃতি। "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত," "মুক্তাবলী," "মণিমালা," "ধাতুমালা" প্রভৃতিও তাঁহার পূর্ব্বেকার রচনা।

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২)—জগদ্বন্ধু বাবু আবাল্য সাহিত্য-সেবক। ইঁহার ছানিফ গাজী ইংরেজি জন গিলপিনের অনুকরণে রচিত। ইঁহার ব্যঙ্গকাব্য 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' সে সময়ে সকলেরই নিকট বিশেষ রূপে সমাদৃত হয়। "বান্ধবে" জগদ্বন্ধু বাবুর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে, সীতারাম রায়, পৃথ্বীরায়, আবুল ফজল, বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক, হীরক, মৌক্তিক, বাড়বানল, বায়ুমহাসাগর, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এবং হিন্দুভূগোল নামক প্রত্নতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। "ঐতিহাসিক গল্প" ইঁহার সুন্দর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ।

শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪২-১৯১১)—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গ ভক্ত পরম বৈষ্ণব। ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমিয় নিমাই চরিত—যাহা আজিও বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অমূল্য রত্ন। এতদ্ভিন্ন অমিয় ভাণ্ডার, কালাচাঁদ গীতা, নয়সো রূপেয়া, নরোত্তম চরিত প্রভৃতি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ইংরেজি ভাষায় লর্ড গৌরাঙ্গ নামক একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। নয়সো রূপেয়াখানি সামাজিক নাটক।

কালীবর বেদান্ত বাগীশ (১৮৪২-১৯১১)—কালীবর বেদান্ত বাগীশ একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত; ইনি পাতঞ্জল দর্শন, গুরুশাস্ত্র, চরিত্রানুমান বিদ্যা, পূর্ব্বমীমাংসার্থ সংগ্রহ, বেদান্ত সংজ্ঞাবাণী, কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, বেদান্ত সার, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের সরল অনুবাদ প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার পরলোক রহস্যে ইনি বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ ও ঘটনাদ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৯১১)—বীরেশ্বর পাঁড়ে বঙ্গভাষার একজন চিন্তাশীল লেখক, ইঁহার ভাষাও বেশ ওজস্বিনী। ইঁহার রচনার মধ্যে মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, আর্য্যপাঠ, আর্য্যচরিত, আর্য্যশিক্ষা, অদ্ভুত স্বপ্ন, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; তন্মধ্যে কতকগুলি শিশুপাঠ্য ও অপরগুলি উচ্চপাঠ্য। উচ্চপাঠ্যগুলিতে দর্শন, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এত সারগর্ভ ও জটিল বিষয় এরূপ সুচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে যাহা পাঠ করিলে প্রবীণেরাও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এরূপ উচ্চঅঙ্গের বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহার সময়ে ছিল না বলিলেই হয়।

ইহার রচনায় যেমন সুমার্জ্জিত ভাষা তেমনি অতি উচ্চ ভাবসমষ্টি পরিলক্ষিত হয়। মানবতত্ত্ব একখানি রীতিমত উচ্চঅঙ্গের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ; ইহার বর্ণিতব্য বিষয় অতি জটিল, অতি দুরূহ হইলেও লেখক নিজ অসামান্য শক্তি ও যোগ্যতার বলে নিজ প্রস্তাব্য বিষয় কেমন প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানবতত্ত্ব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে; স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ। শক্তি প্রকাশের পূর্ব্বভাবের নাম ইচ্ছা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইচ্ছাপূরণ বা সুখই মানবের উদ্দেশ্য। সুখসাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয়। কিন্তু যখন বহু যন্ত্রসংযোগে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন মানবে নানা প্রকার শক্তি নিহিত আছে বলিতে হইবে। যতপ্রকার শক্তি মানবে আছে, তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করা হইল। কিন্তু অন্তর্গত শক্তি সকলের কতকগুলি এরূপ পরস্পরবিরোধী যে একের তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে অপরের বিরোধাচরণ করা হয়; সুতরাং এক বিষয়ে সুখী ও কর্ত্তব্যপর হইতে হইলে অপর বিষয়ে অসুখী ও কর্ত্তব্যবিরত হইতে হয়, এবং মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়। সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে।"

ইনিও ভূদেববাবুর মত বাল্যবিবাহ প্রথার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই

মানবতত্ত্বেই ইনি লিখিয়াছেন: "যখন বিবাহ বন্ধন যাবজ্জীবনের জন্য দৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক তখন বাল্যকালে বিবাহ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহা হইলে দাম্পত্যপ্রণয় আজীবন দৃঢ় থাকিবার অধিক সম্ভব। অধিক বয়সে বিবাহে যে, সেরূপ হইতে পারে না, ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহার প্রমাণ; অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই তথায় নিত্য সহস্র সহস্র বিবাহ ভঙ্গের কারণ হইতেছে। কিন্তু ভারতে বিবাহ ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তথায় পতির মৃত্যুতে সতী আত্মদেহ বিসর্জ্জন করে। * * * বাল্য বিবাহে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই যে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাধীন হয় না, সুতরাং বিবাহান্তে উভয়েই একরূপ সংস্কার বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে। * * বাল্যবিবাহের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, ঐ সময়ে মিলন কালে দম্পতীর মনে কোনও অপবিত্র ভাবের উদয় হয় না। সে সময়ে তাহারা যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইতেছে বোধ করে।"

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, (১৮৪৩-১৯১১)—ইনি বঙ্কিমের যুগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, সদ্বক্তা ও সুলেখক। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে দীনেশ বাবু তাঁহার 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্যে' লিখিয়াছেন—"ভাষা ওজস্বিনী, বাক্যগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,—সমাসবদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন অংশ হীনবল নহে,—এ যেন অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু হইতে শরনিক্ষেপ করিতেছেন—সে গাণ্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য্য নহে,—মেঘনাদবধ কাব্যের মত উন্মাদনাময়ী ভাষা। ২০ মিনিটকাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল * *

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনিলাম, বঙ্গভাষার যে কি ভয়ানক শক্তি—সেদিন বুঝিলাম। * * যত মনস্বী বাগ্মীর বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পাহাড় পর্ব্বত নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধ-স্রোতা ঐরাবত-বিজয়ী দুর্জ্জয় গঙ্গার মত,—বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জ্জনের মত, শিবের প্রণবধ্বনির মত,—বিজয় দুন্দুভির মত—বঙ্গভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীতে যে বঙ্গভাষাকে এলাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় সেই ভাষাকে জয়শ্রীমণ্ডিতা সাম্রাজ্ঞীর মত দেখিয়াছি। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে—সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা মনে হইয়াছিল।" ঐ পুস্তকেরই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা দেশে তাঁহার (কালীপ্রসন্নের) মত কথাবার্ত্তার প্রতিভা আমি আর কাহারও দেখি নাই, তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ছিলেন, কথা বলিবার সময় মনস্বিতায় তাঁহার চোখদুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত ; দুইটি সুন্দর ঠোঁট উৎসাহিতভাবে কথা বলিবার সময় যেন একটু একটু কাঁপিত, কোন তেজস্বিনী নদীস্রোত পুষ্পিত লতার উপর বহিয়া গেলে যেরূপ কাঁপে। যাহা বলিতেন তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ পদে ঠিক পণ্ডিতের লিখিত ভাষার মত শুনাইত, প্রভেদ এই যে তাহা প্রাণের আবেগ বহন করিত। আভিধানিক শব্দগুলি তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকের মত ছিল। তাঁহার ধনুতে জ্যা দিবার শক্তি অন্ত কাহারও ছিল না ; গাণ্ডীব যেরূপ পার্থের, বীণা যেরূপ নারদের তাঁহার ভাষা সেইরূপ তাঁহারই ছিল। তাহা অনুকরণকারীর নৈরাশ্য ও শ্রোতার চির-বিস্ময়।"

"বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাঁহার সাহিত্যসুনাম প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।"

ইঁহার মত প্রগাঢ় চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। ইঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথচিন্তা গভীর গবেষণার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; অপর গ্রন্থের মধ্যে পার্কারের জীবনচরিত, আমেরিকার সভ্যতা (পাণ্ডুলিপিতেই অপহৃত), সঙ্গীত মঞ্জুরী, সমাজ-শোধিনী, বিবাহ-রহস্য, ভক্তির জয়, ছায়া দর্শন, মা না মহাশক্তি, ভ্রান্তি বিনোদপ্রমোদ-লহরী, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালী-প্রসন্নের মত একাধারে পণ্ডিত, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও সুলেখক ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে আর দেখা যায় না। ভক্তির জয়ে ভক্ত-প্রবর যবন হরিদাসের জীবন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্ক মোহন সেন কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যিনি বঙ্গবাণীর আপন চিত্তসঞ্জাত উজ্জ্বল শুভ্র সন্দর্ভ-মুক্তাহার পরাইয়া-ছিলেন, তাঁহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে বহুমানিনী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মুক্তা হীরকের ন্যায় দীর্ঘজীবী বা বহুমূল্য হইবে কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করা আমাদের প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সেই মুক্তা অকুণ্ঠিত উজ্জ্বলতায় মাতৃকণ্ঠে শোভা পাইতেছে; রসজ্ঞ পাঠক বা বঙ্গীয় লেখক মাত্রেই দীপ্তি এবং ওজস্বিতা লাভার্থে তাহার সম্মুখীন হইতেছেন এবং উহা হইতে নানা মতে উপকৃত হইতেছেন। * * *

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন, ইহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের মহাপ্রবাহ আনিয়াছেন; প্রত্যেকে স্বকীয় হৃদয়ের বিশিষ্ট রসেও এ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। * *

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্য গদ্যবিভাগে নবজীবনের শৈশবেই দুইজন কৃতী পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা বাঙ্গালীকে অসীমের

অন্থে দীক্ষিত করিবার জন্য চিরজীবন অস্খলিত সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সে দুইজন যে কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বঙ্গবাসী বিনা বিচারেই স্বীকার করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র কবিগুণসম্পন্ন শিল্পী; তিনি আকৃতিপ্রকৃতির ভিতর দিয়া মহানকে এবং অব্যক্তকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর বা প্রতাপের মধ্যে মনুষ্যত্বপথে সেই অসীমের অনুভবভূমিতে উঠিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন কবিগুণসম্পন্ন দার্শনিক; তিনি তারা ও ফুলে, সাহিত্যে ও জাতীয় বিকাশে, প্রজা ও রাজশক্তিতে ভক্তিতে এবং রসপরিহাসে, প্রভাতে সন্ধ্যায় নিশীথে, সজনে ও বিজনে, ইহকালে ও পরকালে, চিন্তা এবং ভাবুকতার পথে সেই অসীম অব্যক্ত এবং অমৃতকেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন! বঙ্গসাহিত্যে, বাঙ্গলা গদ্যে সমুন্নত অথচ বীর্য্য পৌরুষ যুক্ত ভাবুকতার উচ্ছ্বাসধারণায় কালীপ্রসন্নই অগ্রণী!

সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম এবং পূজ্যতম পদার্থ লেখকের হৃদয়। যে লেখক উদার হৃদয় পাইয়াছেন ও তাহাকে অনাবিল ভাবে প্রকাশ করিবার ভাষা পাইয়াছেন, সাহিত্যে তাঁহারই জয়। * * কালীপ্রসন্নের বুদ্ধিও সর্ব্বথা হৃদয়ানুসারিণী ছিল! প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা বা ভক্তির জয় প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বত্র সেই বিপুল, ওজস্বী এবং তড়িৎ-বিভাসী হৃদয়েরই পরিচয় পাই! ওই হৃদয় একদিকে যেমন শিশুর মত সরল, অন্যদিকে তেমনই গহন প্রবৃত্তি এবং রাজশ্রীতেই সমুন্নত ছিল। তাঁহার ভাষা একদিকে যেমন সরল ও ঋজুগতি, অন্যদিকে তেমনই জ্যোতির্বিলসিত বিপুল আবর্ত্তে কল্লোলিনীর মত ছুটিয়া চলিত! তাঁহার হৃদয় কিংবা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, সংন্যাসীর

হৃদয় অথবা শুষ্ক বৈরাগীর আধ্যাত্মিকতা নহে—অপরূপ জ্ঞান-কর্ম্মে, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে উল্লাসী, অপ্রমত্ত অথচ সুখী, ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা! তিনি জ্ঞানী হইয়াও বৈরাগ্য বিলাসী কিম্বা দুঃখবাদী নহেন। আবার রামই তাঁহার প্রিয় আদর্শ; যুধিষ্ঠির নহেন; সুতরাং তিনি রামায়ণে প্রেমের পরাকাষ্ঠা এবং মহাভারতেও প্রেমের অভাব দেখিয়াছেন! এই কারণেই তাঁহার হৃদয় বিশ্বময় অমৃত-তত্ত্বের অন্বেষণে এবং প্রত্যক্ষীকরণে ধাবিত হইয়াছিল; ঐহিক অমরতার স্বপ্নেও বিস্ফারিত হইয়াছিল! বঙ্গসাহিত্যে এবং এতদ্দেশের মৃত্তিকায় এই প্রকৃতির হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতা নূতন! * উহা হয়ত সর্ব্বদিকে সর্ব্বরূপে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই; ভবিষ্যতের সৌভাগ্যবান সাধকের অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে ইহা নূতন। ইংরাজী সাহিত্যে এ জাতীয় ভাষাপদ্ধতির পরিচয় পাই মিলটনে ও বার্কে; এজাতীয় ভাবনা পদ্ধতির পরিচয়—পাই কার্লাইলে এবং এমার্সনে। উহা পাশ্চাত্য আর্য্যপণ্ডিতের প্রকৃতি। * *

কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ছিলেন। বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া তাঁহার আসন সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে নির্ব্বিশেষে শুনিয়াছি, অন্বর্থ এবং উল্লসিত ত্বরিত বাক্যঘটায় হৃদয়কে তদ্গত আনন্দে অধিকার করিতে বঙ্গভাষার যে এত শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা কালীপ্রসন্নের বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কবি হেমচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি-স্মৃতি-সভায় কালীপ্রসন্ন সভাপতিরূপে কলিকাতায় আহূত হন। সে সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানীর সমস্ত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র একবাক্যে বঙ্গভাষার এই অপূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশক্তির

প্রশংসা করিয়াছিলেন ; ইহা কালীপ্রসন্নের সামান্য গৌরব বা প্রতি-পত্তির কথা নহে।

কালীপ্রসন্নের হৃদয় নিয়ত ভাবের উচ্চগ্রামে বিচরণ করিতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিত—তাঁহার কণ্ঠও তারস্বরে বিলসিত হইত। * * সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে তাঁহার নিরাবিল সহৃদয়তা, সাহিত্যসেবীর প্রতি তাঁহার সদয় সহানুভূতি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। * *

বঙ্গভাষা এখন নানা সাহিত্য ও প্রতিভার সংসর্গে বহুমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন ; কাব্যে সঙ্গীতে, ইতিহাসে উপন্যাসে, দর্শনে এবং সন্দর্ভে বঙ্গভাষা এখন নানা মূর্ত্তি ও প্রবৃত্তি আশ্রয় করিয়া আপনার সাফল্যকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। * * [কালীপ্রসন্ন] স্বয়ং এ সাহিত্যের শক্তি-সাধন করিয়া উহার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি বিষয়ে অতন্দ্রিতভাবে সেবা-তৎপর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। * *

কালীপ্রসন্ন প্রাকৃত বাক্য-প্রণালীর সবিশেষ বিরোধী ছিলেন ; * * অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে 'কালীপ্রসন্নের লেখা যে অতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, এইরূপ বিচার-বাক্য নির্লজ্জ গর্ব্বে প্রচারিত হইতেও শুনিতে হয়! * *

কালীপ্রসন্ন অপেক্ষা জটিল বা গভীর ভাবগ্রাহী লেখক হয়ত বঙ্গ-সাহিত্যে জন্মিয়াছেন ; কিন্তু ভাবানুগত ভাষার স্থির শক্তি, উল্লসিত গতি এবং ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে কালীপ্রসন্ন অদ্বিতীয়। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব ও প্রভাত চিন্তার আনন্দ-স্তব্ধ 'নীরব কবি' হইতে 'ছায়াদর্শনের' অনন্ত ব্যাপিনী অমরত্ব তৃষা-পর্য্যন্ত, যে বৃহৎ, মহৎ ও উদার হৃদয়ের আত্মজীবনী প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্র ভাষা এবং ভাবনার রীতির একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গভীর ঐক্যসূত্র এবং

সামঞ্জস্য আছে। উহার ভিতর বিপুল সমুদ্রের অনন্তমুখিন্ প্রাণাবেগ এবং দীর্ঘনিশ্বাস ও প্রত্যক্ষরসিতকতার পরিচয় আছে; মনুষ্যের নিকটে নিজের বরিষ্ঠ এবং অনন্ত মুহূর্ত্তগুলির সুসম্বাদ বহন করিবার একনিষ্ঠ প্রয়াস আছে। ইহাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা; তিনি এই সাধনায় কর্ম্মোপযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমাদে হৃদয় অদ্য তাঁহার এই মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ!"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩—?)—

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার রচনার মধ্যে শরৎশশী, বিজ্ঞান দর্শক, হরিদাস সাধু ও চিত্ত চৈতন্যউদয় উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রসিদ্ধ নাটককার ও অভিনেতা; ইনি বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন; এইজন্য অনেকে ইঁহাকে "বাঙ্গালা'র গ্যারিক" আখ্যা দিয়া থাকেন। উপন্যাসে যেমন বঙ্কিম, নাটকে সেইরূপ গিরিশচন্দ্র। ইনি পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, ধর্ম্মমূলক প্রভৃতি অন্যূন ৭০ খানি বাঙ্গালা নাটক গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন। ইনিও এই বঙ্কিমের যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। ইহার ভাষা যেমন মধুর তেমনি ওজস্বিনী, যেমন প্রাঞ্জল তেমনি প্রাণস্পর্শী—নাটকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। এই জন্যই ইহাকে বাঙ্গালার নাট্যসম্রাট বলে। নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রসিদ্ধ সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার বাণী-মন্দির নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাখা ছিল না, তাই তিনি

ভাবের আকাশে উড়িতে চেষ্টাই করেন নাই; আস্ত সমতল মাটীর উপর দিয়া পায়চারি করিয়াই গিয়াছেন। * * কবিত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহার বিপুল নাট্যরাজী হইতে কতিপয় সঙ্গীত ব্যতীত তদনুরূপ দশটী পংক্তি পরিচিহ্নিত করাই দুস্কর! অথচ গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা; সহানুভূতির শক্তিও বিপুল; পাণ্ডিত্য—অন্ততঃ এলিজাবেথ-যুগের ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের পুঁথিবিদ্যাও সামান্য নহে। সে যুগের বিলাতী নাট্যকারগণকে ইনি যেন ছেঁচিয়া—পুড়িয়া খাইয়া হজম করিয়া বসিয়াছেন; পদে পদে তাঁহাদের শিল্পকৌশল, ঘটনা ও অবস্থার সংস্থান এবং সংযোজনা তাঁহার লেখনীতে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি, আমাদের হৃদয় ডাকিয়া উঠে, কোনরূপ সাহিত্য রচনায় তিনি যেন লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার একটী নাটকও যেন 'কাব্য' নহে, গদ্যও নহে, সুন্দর পদ্যও নহে—তাঁহার নিজের কথায় 'গৈরিশী' ছন্দে রচিত হইলেও পদ্য নহে। মধুসূদন বা হেম নবীনের সমকক্ষ ভাবুকতা ত দূরের কথা, তুলনযোগ্য বাক্যশক্তি, বিবরণী কিংবা বর্ণণী শক্তির পরিচয়ও গিরিশচন্দ্রে পাওয়া যায় না। প্রকৃত বাণীপুত্রের কথার মধ্যেই যে একটা 'সাধনা'র গন্ধ থাকে, একটা 'সাধা গলা'র আমেজ এবং বৈশিষ্ট্য থাকে এই বিপুলকর্ম্মা লেখকের মধ্যে তাহারই অভাব! ভাষা এত সাধারণ এবং ভাবুকতা এত দুর্ব্বল যে, কথার বাঁধুনি এত শিথিল ও শব্দশক্তি এত বৈশিষ্ট্যহীন এবং কাহিল যে কোথাও উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী মনস্বিতা কিংবা তেজস্বিতা লাভ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের প্রথম বস্তু যে ভাষা, তাহার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। মনুষ্যজীবনের কোন গভীর সমস্যার ধারণা, জীবনের আলেখ্য রচনাতে উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী কোনরূপ সূক্ষ্মতা কি গভীরতার পরিচয় কিংবা

কোন প্রকার মনোমত্তা ও উচ্চ শ্রেণীর মনোজীবনের প্রমাণ গিরিশ-চন্দ্রের মধ্যে উদগ্র হইতে পারিতেছে না! সাধারণ তাঁহার শ্রোতা; সাধারণ বিষয়; বক্তাও কোনদিকে অসাধারণ নহেন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পূজনীয় পদবী—বঙ্গদেশের সাধারণ সামাজিকের শিক্ষাব্যাপারেও সুতরাং তাঁহার গৌরবময় স্থান। কিন্তু বিপুল বিস্তারিত সারস্বতশক্তির লীলাব্যাপারসত্ত্বেও উহাতে যে সমুচ্চ 'সাহিত্য'-আদর্শের সৌন্দর্য্যপ্রকাশ কিঞ্চিন্মাত্র না ঘটিতে পারে, উহা যে 'কাব্য' আদর্শের একেবারে পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতে পারে; তাহার দৃষ্টান্তস্থান গিরিশচন্দ্র। অথচ গিরিশচন্দ্র পল্লবগ্রাহী নহেন; পাতলা মতি বা অস্থিরচরিত্রের ব্যক্তি নিশ্চয়ই নহেন; সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্ব্বৃত্ততা কিংবা দৌরাত্ম্যও তাঁহার নাই। তথাপি শতসংখ্যক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াও, বাণীমন্দিরের অন্তরঙ্গ সাধকরূপে তিনি আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন না! এ-ব্যাপারের হেতুযোগ কোথায়, এ অনর্থের মূল কোথায় সাহিত্যসেবক তদনুসন্ধানে কোন সময় ব্যয় করিলে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপব্যয় হইবে না।

গিরিশচন্দ্র যাহাই লেখেন তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে যেন উহার প্রকৃত যোগ নাই। নিজের বহির্ব্বাটীর 'বৈঠকখানা'য় বসিয়া গিরিশচন্দ্র যেন কেবল বুদ্ধিসংযোগে অভিনয় করিয়া যাইতেছেন; অপর কোন একব্যক্তি উহা লিখিয়া চলিয়াছে! এই সাময়িকতা, সময়—সেবা ও তন্মুহূর্ত্তে লিপিবদ্ধ করার অপিচ dictate করার গন্ধ গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেক রচনাতেই সহৃদয়বেদ্য হইয়া আছে!"

বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা শশাঙ্কবাবুর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। তবে, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এক শ্রেণীর,

অন্ততঃ একজন বিশিষ্ট সমালোচকের, স্বাধীন মত হিসাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ প্রদর্শিত হইল। আমাদের মতে গিরিশচন্দ্রে দোষ থাকিলেও তাহা গুণের আধিক্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৪) কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। ইনি বাঙ্গালায় 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক একখানি দর্শনমূলক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াগিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১৪)—শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা, ফুল ও ফল, ভারতরত্নমালা, কঃ পন্থা, নারসিংহপুরাণ, পৃথিবীর সুখদুঃখ, হরিবংশ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, হিন্দুত্ব, সংযমশিক্ষা, সাবিত্রীতত্ত্ব, বর্ত্তমান বাঙ্লা সাহিত্যের প্রকৃতি, পশুপতিসংবাদ, বেতালে বহুরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত নূতনপাঠ প্রভৃতি বালকগণের পাঠোপযোগী স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও কয়েকখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজিতে পণ্ডিত হইলেও ইঁহার রচনায় ইংরেজির প্রাধান্য নাই; প্রত্যুত ইঁহার রচনায় যথেষ্ট মৌলিক গবেষণা পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালায় ইনি একজন সুদক্ষ সমালোচক। শকুন্তলাতত্ত্ব ইঁহার সমালোচনাশক্তির নিদর্শন; এই পুস্তকে তিনি মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমালোচনা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার মতের সহিত অপরের মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। তিনি এই পুস্তকে কালিদাসকে শেক্ষপীর অপেক্ষাও বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যে তাঁহার এই মত সমর্থন না করিলেও, এই পুস্তকখানি তাঁহার স্বাধীন নিরপেক্ষ অনুশীলনের ফল—বলা যাইতে পারে। পুস্তক

খানির ভাষাও সুললিত, প্রাঞ্জল এবং হৃদয়স্পর্শী ; দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম : "শার্ঙ্গরব ঋষিকুমার। তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না, পার্থিববল, পার্থিব শক্তি, পার্থিবসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয়। তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা। তিনি রক্ত মাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ। তিনি শান্তি নন, তিনি প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন :— বিনিপাত :।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীম মহিমামণ্ডিত পুরুসভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বিনিপাতঃ।' মহর্ষি কণ্ব হিমাচলের ন্যায় দরদর ধারায় গলিতেও পারেন এবং বিন্ধ্যবিয়সের ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেও পারেন ! কল্পনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে ! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে !

যদিও মহর্ষি কণ্বের সম্পর্কে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত একই ব্যক্তি, কিন্তু কণ্ব হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে অতি চমৎকার প্রভেদ লক্ষিত হয়—দুইজনকে প্রকৃষ্টরূপে দুই ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। * * শার্ঙ্গরব কিছু বাহ্যদর্শী ; শারদ্বত অন্তর্দর্শী। * * শার্ঙ্গরব ব্যহ্যজগতের কবি ; শারদ্বত অন্তর্জগতের কবি। শার্ঙ্গরব বাহ্যস্ফূর্ত্তি ; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। * * *

প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী। এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই তিনটীতে একটি। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন; তিনটির একই কাজ; তিনটিরর এক চিন্তা, এক হৃদয়। তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না। * * শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই বয়স, কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম। * * প্রিয়ম্বদা রঙ্গ করিতে ভাল বাসেন; শকুন্তলা রঙ্গ বুঝেন, কিন্তু রঙ্গ করিতে পারেন না; অনসূয়া রঙ্গ করিতে শেখেন নাই। অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম। * * অনসূয়া সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী। তারপর যখন দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন তখন অনসূয়া তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জ্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল তখন প্রিয়ম্বদাই একটা ছল করিয়া অনসূয়াকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোট ফোট। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিত পদ্মের ন্যায় সে ফুলের সমস্ত গৌরব পাপড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদা গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহাতেই চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছেন। অনসূয়ার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্যময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে। কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারী-প্রকৃতির প্রতিমা অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী। * * *

* * * এত গভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে কয়খানা নাটকে আছে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা তিন কি চারিখানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই তিন চারি খানার মধ্যে একখানা। গেটের 'ফাউষ্ট' আর একখানা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েট'ও আর একখানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তল এবং 'ফাউষ্ট' অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। * * *

কালিদাস! তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে। দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' ”

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪৪-১৯১৯)—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' নাম দিয়া কয়েকখানি পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভক্তি চৈতন্যচন্দ্রিকা, ইহকাল পরকাল, কেশবচরিত, বিধান ভারত, পথের সম্বল, গীতরত্নাবলী, বিংশশতাব্দী, গরলে অমৃত, কলি সংহার, যৌবন সংহার, ব্রহ্মগীতা, নববৃন্দাবন, যুগলমিলন, ঈশা-চরিত, সাধু অঘোরনাথ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত—ইঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ইঁহার বাল্যসখা কয় ভাগ এককালে শিশুদিগের জ্ঞানগর্ভ পাঠ্যপুস্তক ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪৪-১৯০৯)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন খুব বৈচিত্র্যময় বটে; হিন্দুর সন্তান কেশবসেনের দলে মিশিয়া হঠাৎ উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে আবার কেশবসেনের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ লইয়া কেশব সেনের সহিত মত ভেদ হওয়ায় ইঁহারই উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ জীবনে ইনি পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও পুনরায় উপবীত ধারণ করেন। পুরীতে ইনি অনেক দিন যাপন করেন ও পুরীর উন্নতি বিধান কল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথম বয়সে বিশেষ যত্নের সহিত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সারাজীবন ধর্ম্ম লইয়া কাটাইয়াছিলেন; অনেক দিন পরিব্রাজক ভাবেও ছিলেন। ইঁহার রচিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ; তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্ম্মচর্চ্চার সারাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৯১)—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্ণলতা, তিনটী গল্প, অদৃষ্ট, হরিষে বিষাদ, ললিত সৌদামিনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। কোন ইংরেজি সমালোচক বলিয়াছেন কবি গ্রে যদি অন্য কিছু না লিখিয়া শুধু Elegy written in a Country Churchyard লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি ইংরেজি লেখকদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তারকনাথবাবুও শুধু স্বর্ণলতা লিখিয়া গেলে বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন। তাঁহার স্বর্ণলতা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হইয়া অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বালকগণের পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বর্ণলতার মত নিখুঁত গার্হস্থ্য চিত্রপূর্ণ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

ডাক্তার রামদাস সেন (১৮৪৫—১৮৮৭)—

ডাক্তার রামদাস সেন আর একজন ধনী সাহিত্যিক। ধনীর সন্তান হইয়াও, ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বা মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মত অত্যন্ত সাহিত্যামোদী লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই

ইনি সংবাদ পত্রে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইঁহার ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য ও রত্নরহস্য,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রচুর মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। "ইঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আদরপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন বৃত্তান্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ এবং তাম্রশাসনাদি হইতে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন।" *

প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরের Oriental Academy হইতে ইনি Doctor উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি "কলিকাতা লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের অনেক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত [ছিলেন]। ইনি ভট্ট মোক্ষমুলর, বুলার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট পত্র লিখিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মতামত [আনয়ন করিতেন]।" *

নানা স্থান নানা দেশ হইতে বহু ব্যয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইনি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। বড় দুঃখের বিষয় ইনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে নিপতিত হন। অধিক দিন বাঁচিলে ইঁহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের আরও অনেক উপকার হইতে পারিত।

রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, (১৮৪৫-?)— রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালাভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাকৃত ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিপুল অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

* দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬)—মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, লর্ড মেটকাফের জীবনী, অযোধ্যার বেগম, ঝান্সীর রাণী, টমকাকার কুটীর, এই কি রামের অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ইঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক সত্য বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে ইঁহার গ্রন্থগুলি সমধিক মূল্যবান। ইঁহার রচনা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী ভাষাও তেমনি ওজস্বিনী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭)—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক। ইঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ১২৮৬ সালে ঢাকা কলেজগৃহে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র অজরচন্দ্রও একজন বর্ত্তমান খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী। কমলাকান্তের দপ্তরে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটী অক্ষয়চন্দ্রেরই লেখনী-প্রসূত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শন, সাধারণ ও নবজীবন প্রভৃতি পত্রাদিতে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ইঁহার বহুপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশবাবু বলিয়াছেন—"যখন বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগে অন্ধ হইয়া দেশীয় পুঁথিগুলিকে তামাকপাতার মত অশ্রদ্ধেয় মনে করিত, তখন ইনি ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী হইয়াও তারতম্যে বাঙ্গালা গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।"

ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া অক্ষয়কুমার চিরজীবন সাহিত্য সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ইঁহার প্রণীত সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, গোচারণের মাঠ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, হাতে হাতে ফল, পিতাপুত্র,

মোতি কুমারী, সাহিত্য পাঠ, সাহিত্য-সাধনা, মহাপূজা, রূপক ও রহস্য প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটী ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই প্রবন্ধটী বঙ্গশ্রীতে বাহির হইতেছে। সমালোচক হিসাবেও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার স্থান অনেক উচ্চে। কবি মধুসূদনের সহিত কবি হেমচন্দ্রের তুলনা কল্পে ইনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম: "কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের এরূপ ভক্ত, এরূপ গোঁড়া, এরূপ শিষ্যানুকল্প হইয়াও 'মিতাক্ষর' গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই, তিনি জানেন। ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন এখন আমি বলিতে পারিব না। তবে একটা কথা প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, যদি 'মিতাক্ষর' কেবল নিগড়-বন্ধনমোচনের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সেটা কিছু মহদুদ্দেশ্য সাধন নহে। চুড়, বলয়, অনন্ত—এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চুড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তালও ত সুরের নিগড়। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? তা নয়। দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি-শশী। ছন্দত নিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য-জগতে। নিগড়-ছেদনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে কারণেই হউক হেমচন্দ্র মধুসূদনের মিতাক্ষর গ্রহণ করেন নাই। তবে মধুসূদনের কবিত্ব তিনি বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন কখন পারি না। * * বীরকাব্যে হেমচন্দ্র সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের

নিম্নস্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিম্নে; সমকালবর্ত্তী 'শিক্ষিত' মধুসূদনেরও নিম্নে। * * বৃত্রসংহারে ছন্দ-বৈচিত্র্য থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে; মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে। তবে যুদ্ধ-বর্ণনা,—ওটি আমি ভাল বুঝি না।"

এইস্থলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রের স্বরচিত জীবন চরিতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। ইহা হইতে যে কেবল তাঁহার রচনা পারিপাট্যের বা তাঁহার সুনিপুণ সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা নহে; অধিকন্তু ইহা হইতে সে সময়ের ও তৎপূর্ব্ব সময়ের অনেক মূল্যবান তথ্যও অবগত হইতে পারা যাইবে এবং তৎসঙ্গে অতি সংক্ষেপে অথচ অতি নিপুণ ভাবে বিবৃত সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের এক ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে। এই নিমিত্তই এ উদ্ধৃতাংশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া গেল;—

"প্রথম গদ্য লেখক, রাজীব লোচন রায়। তিনি আন্দাজি ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রাজ বংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গদ্য-গ্রন্থকার রাম রাম বসু। তিনি প্রতাপ আদিত্যের জীবন চরিত লেখেন। এইদুই গ্রন্থই বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়। * * * তৃতীয় গদ্য গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। * * * মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গগদ্য সাহিত্যের একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে তিনি স্বয়ং ভাষার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। * * *

তখনকার [গঙ্গাচরণ সরকারের সময়ের] সাহিত্য সেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনা-

টমিক্যাল ডিসেক্‌সন্। অস্থিমাংস চর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্য গ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুইছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরী বাহির করিয়া, তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড ২ করি, তাহার পর আবার বোতলে পূরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমিত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল একজামিনার, রসায়নিক পরীক্ষক,—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখনা কেন, ইহার মধ্যে কি আছে? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য সেবা এইরূপ, আর তখনকার সেই কাদম্বরী পাঠ যেন বিশ্বেশ্বরের আরতি সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্ গদ্ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্য পূজা। এখনকার মত ছুরি কাঁচি বরষী লইয়া সাহিত্য-ভেদ সাহিত্য-বেধ সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না। হায় আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি!

* * * *

সপ্তমবর্ষে আমি প্রভাকর [ঈশ্বর গুপ্তের] পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে [অর্থাৎ ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে] অন্নদা মঙ্গল, তিনখণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধ বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরব্যোপাখ্যান ও সেক্সপীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান পাল-বর্জ্জিনিয়া

প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। * * বি, এল, গুপ্তের মত সুন্দর সাধুভাষায় বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন ; * * * লেখা অতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও তরল। * * * [১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে] ফোকাল ডিস্টানস্ পদার্থটা কি, কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য তখন কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শিখিয়া ছিলাম'। 'আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, পঞ্চপাদিক মানে বুঝিয়া ছিলাম, যাহার পরিমাণ পাঁচ ফুট। ইত্যাদি ইত্যাদি। * * *

[দত্ত] অক্ষয় কুমারের কথা সকল—অতি গভীর, লেখা প্রগাঢ়, ভাব গম্ভীর, তবু সে ভাল লাগিত, অথচ কৃষ্ণ বন্দ্যোর রাজোপাখ্যান কেবল গল্প বইত নয়, তাহা ভাল লাগিত না। * * *

একদিকে অক্ষয় কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্যদিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চক্চকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,—এই গৌরব এই আদর দেখিয়া বালকহৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেল্না জিনিষ নয়। * * * সহজ বাঙ্গালা আমি এখনও ফেল্না জিনিষ মনে করিনা। * * *

আমরা দশজনে এখন কত রকম বাঙ্গালা লিখিতেছি। কেহ ঝাড় ঝঙ্কার দিতেছি ; কেহ ফুলে ফলে শোভিত করিতেছি ; কেহ পেঁচের পর পেঁচ লাগাইয়া ভাষার কায়দা বিন্যাসে গোলকধাঁধা করিতেছি। কিন্তু মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ,সরল, সহজ, মিঠা-কড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ভাষা লিখিতে পারি কি ?

দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূরচূড়া, টেরি কাটা কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বরগুপ্ত. মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব চাল চিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক। * * তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুরতাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখন নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয় কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরেরপ্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও যে বেশ জানি সে কথা বলিয়া বুড়ো বয়সে অধর্ম্ম সঞ্চয় নাই করিলাম। * * *

কৃষ্ণবন্দ্যোর বাঙ্গালায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গালা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (ষ্টাইল) না আছে রস, না আছে আবেগ। * * *

অক্ষয় কুমার,—বিদ্যাসাগর,—বাঙ্গালার দুটা বাঘা ভালুকো লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। স্বদেশ-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ববোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। * * তত্ত্ববোধিনীতে পৌত্তলিকতার বিরোধ প্রকাশিত হইত না। * *

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয় কুমার দত্ত উভয়েই সাধু বাঙ্গালার লেখক; উঁহাদের দুইজন হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের গৌরব, সে বাঙ্গালা

সাধু বাঙ্গালা। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে লেখনী চালনা করেন, পন্থা প্রদর্শন করেন,—প্যারী চাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য পড়িতাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রচলিত বাঙ্গালা অবহেলার সামগ্রী নহে। তাহার পর সেই সময়েই যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্র' পড়িতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম, যে সহজ সরল, চলিত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালীর সদাচার অনাচারের কথা, হাসি তামাসার কথা, লিখিলেও সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানের কথা পড়িতাম ; সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না। বিদ্যাসাগরের বেতাল পঁচিশে পূর্ব্বকালের কথা পড়িতাম। * * কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরে এই কালের, এই বাঙ্গালির, প্রাত্যহিক জীবনের কথা, ঘরকন্নার কথা, সমাজের কথা, সহজ কথায় দেখিতে পাইলাম। সেই শিশুজীবনে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের গাম্ভীর্য্যে, রচনাচ্ছটায়, ভাবের ঘটায় ভুলিয়াছিলাম। টেকচাঁদের বিনা আড়ম্বর সরলতায়ও সেইরূপ বিমুগ্ধ হইলাম। গদ্যের গঙ্গাযমুনা স্রোত, আর ঈশ্বরগুপ্তের পদ্যের সরস্বতী আমার বাল্যজীবনের প্রয়াগস্থলে সমানে বহিতে লাগিল। আমি সেই মহা সঙ্গমতীর্থে মহানন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে কৃতার্থতা লাভ করিলাম। * * *

আলালের ঘরের দুলালে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র আছে। ভাল মন্দ দুই আছে। মদ খাওয়া প্রবন্ধে মদের-দোষ নানাভাবে, গল্পের ডাল পালা দিয়া বুঝান হইয়াছে। রামারঞ্জিকায় হরিহর পদ্মাবতী দম্পতি মধ্যে আপনাদের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে কাদম্বরীকার তারাশঙ্কর

স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। * * রামারঞ্জিকাতে মিত্র মহাশয় সেই কথারই বিশদরূপে এবং বিস্তারিত ভাবে সমর্থন করেন। আমি উভয় গ্রন্থই সমাদরের সহিত পড়িয়া ছিলাম। * * বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটী যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। * * *

রামকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'

[এক ফেরি ওয়ালার নিকট] একদিন নাড়িতে নাড়িতে একখানি এড়াতে চটি বই পাইলাম, * নাম 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'; এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, 'আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ বর্ষ বয়স্কা এক ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়ন যুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবা-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভর ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে

পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, কোন দিন মছলী বন্দরে মাস্তুলের বন, কোন দিন সাফা উর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মন্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র— এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।'

অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' ভাষার বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না। * * বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনিনা, বা লিখিতে দেখিনা। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। * * আমি বালক কালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। * *

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করাইয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেঁচার নক্সা। আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নক্সা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। * * মনে করিলাম আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফোয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী * *

যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার (ভূদেব বাবুর) শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। বোধ করি, বিবিধার্থ সংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। * *

ইদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গালার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারি, কোন্‌টা পথ, কোন্‌টা অপথ, কোন্‌টা কুপথ, একটু একটু চিনিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথমদিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। * * বুঝিয়াছিলাম সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও রয়স্কা কুলীন কন্যার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। * * যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া, সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালীকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতার কলেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য

অথচ 'রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র 'কপালকুণ্ডলা' লিখিলেই, কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিলনা। * * বঙ্কিম বাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। * *

পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতে ছিলেন। * * তিনি [কালীপ্রসন্ন] বঙ্গের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন। ঢাকায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। * * * ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে ঢাকার কলেজ ভবনে পিতা বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানিও বড় বড় অক্ষরে ৭৪ পৃষ্ঠায় সাধারণী যন্ত্রে ছাপিয়াছিল। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পর্য্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিশদরূপে আছে। ইহার শেষভাগের দুই দশ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দিতেছি।

'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন চরিতের পর, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্ত মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জনসোনিয়ান ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্য-ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিক্ষণ থাকে না। এইজন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই। * * ইহার কিছুদিন পরে সাহিত্য সংসারে আর একজন আশ্চর্য্য লেখক প্রবেশ করিলেন। বাবু

বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নামিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতি মোহকর নহে, কেবল মধু পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তাড়িত্তেজ প্রভূত ভাবে বহিতেছে, ইহা ভাব-বৈভবেও অতি ঐশ্বর্য্যশালী। বঙ্কিমবাবু কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনা শক্তিও অতি বলবতী। অতএব তিনি যেমন একদিক হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিক হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুরি-ময়ী, তেমনি শক্তি সম্পন্না ও ভাব পরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যেদিন বঙ্কিম বাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিলেন, সেইদিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল; উন্নতির স্রোত তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দরসে গলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু হইতেই বঙ্গবাসীগণ 'সক' করিয়া বাঙ্গালা বই পড়িতে শিখিয়াছে।' এই সময়ে ঢাকায় পিতার চারি পোয়া প্রতিষ্ঠা হইল। * *

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির রস আমরা পিতাপুত্রে লোফালুফি করিয়া উপভোগ করিতাম। সেক্‌সপিয়ারের নাটকের রস তাঁহার পাদমূলে বসিয়াই উপভোগ করিয়াছি।"

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)—কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একখানি গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন—নাম 'আমার জীবন'—৫ খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে কবি আত্মজীবনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে তৎকালীন অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের অল্প বিস্তর অনুশীলনও ইহাতে

পাওয়া যায়। সে হিসাবে 'আমার জীবন' পুস্তকের কয়খণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যিকের বড় মূল্যবান পুস্তক। আমার জীবন ইতিহাসের সার্চলাইট, রাজনৈতিক দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ ও স্বদেশ প্রেমের পূতভরঙ্গ। পুস্তকখানির ভাষা বড় প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। বিলাতী সাহিত্যে Confessions of Rousseau, Pepys's Diary, Franklin's Autobiography প্রভৃতি অনেকগুলি আত্ম-জীবনচরিত থাকিলেও বাঙ্গালায় এই ধরণের পুস্তক অতি বিরল। পূর্ব্বোক্ত কুমুদ নাথ দাস বলিয়াছেন "Amar Jiban (My life) and Prabaser Patra (Letters from Abroad) are two principal prose works of the poet of which both are interesting, though one should very much wish that the auto-biography were free from all touches of egotism which occasionally disfigure it" কবির কাব্যগ্রন্থ সমূহ আমাদের এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করা হইল না।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৮৮৬)—

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস, নানা প্রবন্ধ প্রভৃতির রচয়িতা। ইঁহার পদ্য রচনাও অনেক ছিল। ইনিও বঙ্কিম চন্দ্রের সমসাময়িক লোক। ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য সম্পদ আরও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। ইঁহার রচনার শক্তিও যথেষ্ট ছিল।

কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪৬—১৯১৫)—

কালীবর বেদান্তবাগীশ দর্শন সম্বন্ধীয় জটিল সংস্কৃত পুস্তকগুলিকে যথাসম্ভব বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া মাতৃবাঙ্গালা

ভাষাবিদ্‌গণের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন, শুক্রশাস্ত্র, চরিত্রানুমানবিদ্যা সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন, বেদান্তসার, পূর্ব্বমীমাংসার্থ-সংগ্রহ, বেদান্তসংজ্ঞাবলী, পরলোকরহস্য, কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)—

শিবনাথ শাস্ত্রী মেজ বৌ, যুগান্তর, বিধবার ছেলে, নয়নতারা, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ প্রভৃতির রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত ইহার কবিতা রচনাও আছে; তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। ইঁহার আত্মচরিতও বাঙ্গালাভাষার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি একজন সুবক্তা ছিলেন; ইঁহার বক্তৃতা যেমন সারগর্ভ তেমনই হৃদয়গ্রাহী। ইনি ব্রাহ্ম হইলেও ইঁহার রচনা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জ্জিত।

শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসে লেখকের সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ণনাশক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রকৃত কোন সংযোগ বা সামঞ্জস্য মোটেই পরিস্ফুট না হওয়ায় উহা শিল্পের আকার-প্রকার গত 'ব্যক্তিত্ব' হিসাবে নিদারুণ ভাবেই খণ্ডিত এবং পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।" *

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)—

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মভূমি মাসিকপত্রিকায় অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইঁহার অগ্রজ ভ্রাতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে ইনিই প্রথম বিশ্বকোষ নামক সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদন আরম্ভ করেন। ইংরেজী, হিন্দী, উড়িয়া পার্শী, উর্দ্দূ সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায়

* বাণীমন্দির—পৃষ্ঠা ২০৩-৪

ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা দিগম্বর, মুক্তামালা প্রভৃতি ইঁহারই রচিত। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুল পাঠ্য গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ—Art Manufactures of India.

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯)—

ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইলেও বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্র দত্তের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার, সমাজ প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করেন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগ প্রবাসে ব্যয়িত হইলেও সংসার এবং সমাজে ইনি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ঘটনাবলীর যেরূপ নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ইঁহার তীক্ষ্নদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ লইয়া যে তুমুল সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তাহার ছায়া বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁহার বিষবৃক্ষ প্রভৃতি পুস্তকে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; শিবনাথ শাস্ত্রীর পুস্তকেও এ আন্দোলনের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ লইয়া হিন্দুসমাজে সে সময়ে একটা তুমুল আন্দোলন তুলিয়া গিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের নাম ঐতিহাসিক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্কিমের অনুকরণে লিখিত ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও নিন্দনীয় নহে। এতদ্ব্যতীত ইনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন—তাহা 'ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ'; ইহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের

ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। ইঁহার অপর গ্রন্থের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও হিন্দুশাস্ত্র ২ ভাগও উল্লেখযোগ্য।

সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮-১৯১৭)—সারদাচরণ মিত্র উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ ও কায়স্থকারিকা নামক একখানি সামাজিক পুস্তক লিখিয়াছেন। ভারতে একলিপি বিস্তারার্থ ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজিয়তি ত্যাগের পর ইনি বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী সটীক সংস্করণও প্রকাশিত করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)—অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট গৌরব-বৃদ্ধি করেন। ইঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীর চরিত, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, প্রিয়দর্শিকা, সবুজ সয়তান, অলীকবাবু, বেড়ালের স্বর্গ, মা, খুকুমণি, ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, অভিশপ্ত বাড়ী, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অশ্রুমতী, মিলিতোনা, সত্যসুন্দর মঙ্গল—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি সে সময়ে লোকে আদর করিয়া পড়িত। ইনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত।

প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯০০)—প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীক ও হিন্দু, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, মণিহারী, অনুভূতি প্রভৃতি সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) : বাঙ্গালা সাহিত্যে

ব্যঙ্গরসাত্মক হাস্যোদ্দীপক রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন সার্ভেন্টিস বঙ্গসাহিত্যে তেমনি ইন্দ্রনাথ। ইঁহার চিরপ্রসিদ্ধ পঞ্চানন্দ অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার হইলেও ইহাতে যথেষ্ট গবেষণাপূর্ণ জিনিষও আছে। ইঁহার কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, পাঁচুঠাকুর, পঞ্চানন্দ (মাসিক পত্র) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের চির আদরের জিনিষ। ইনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ে প্রখরদৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঙ্গরসাত্মক লেখক সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের রচনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুর ব্যঙ্গ রচনা নিতান্ত সেকেলে ধরণের; তারপর ইন্দ্রনাথ ও বঙ্গবাসী সম্পাদক যোগেন্দ্র বসু; আর আমাদের বর্ত্তমানের রসের শুঁড়া রসিক চূড়ামণি ললিত বিদ্যারত্ন। অবশ্য ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যঙ্গরস, হাস্যরস প্রত্যেকের রচনাতে থাকিলেও প্রত্যেকেরই প্রভূত মৌলিকতা আছে। শেষজীবনে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালা ও ব্যাকরণ সংস্কার লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া ছিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯—১৯০২)—কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) বঙ্গভাষাকে অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন; তন্মধ্যে গীতার্থ সন্দীপনী, টীকা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভক্তি ও ভক্ত, পরিব্রাজকের বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি, রাম গীতা, পরিব্রাজকের সঙ্গীত, নীতিরত্ন মালা, পঞ্চামৃত, প্রবোধ কৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী, যোগ-ও যোগী, স্বপ্নতত্ত্ব, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা-বলীতে যেমন উচ্চভাব তেমনি প্রাঞ্জল বেগময়ী ভাষা পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যাসাগরের যুগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১)—

এইবার আমরা 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-পরিচর্য্যা সংক্ষেপে অনুশীলন করিব। অধুনা যে বঙ্গভাষা অনুপম শোভারাশিতে পরিশোভিতা হইয়া পাঠকগণের দর্শনেন্দ্রিয়ের তথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, যে সুমধুর ভাষার সুললিত পদবিন্যাস সপ্তস্বরা বীণার তাললয় পরিশুদ্ধ ঝঙ্কারের মত ইদানীং আমাদিগের কর্ণকুহরে পীযুষধারা বর্ষণ করিতেছে, যে ভাষার ভুবনমোহিনী শক্তি ও বহু বিভূতি বিলোকনে আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় প্রভূত আনন্দরসে পরিপ্লুত, যে ভাষার ক্রমোন্নতি ও পরিবর্দ্ধমাণ অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ে আজ যুগপৎ অপলকনেত্রে তাকাইয়া আছে,—সেই বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি-সংসাধনের নিমিত্ত, তাহার হীনবলদেহে শক্তিবারি সিঞ্চনের জন্ত, পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুভক্ষণে শুভলগ্নে লেখনী ধারণ করেন। তিনিই এই নিপতিত অনাদৃত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া সারাজীবন অবিচলিত ধৈর্য্য ও অক্লান্ত উত্তমসহকারে ইহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে নিদারুণ দুঃখশোক-ভারাক্রান্ত অবস্থায় যে ভাষায় রোদন করিয়াছি, যে ভাষায় হাসিয়া স্নেহময়ী জননীর প্রীতিসংবর্দ্ধন

করিয়াছি, ছেলেবেলার ধূলাখেলার ও আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, যে ভাষায় কাঁদিয়া হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রাণের দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিয়াছি, যে ভাষার অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি প্রভাবে প্রাণ-মাতান চিরমধুময় পীযূষপূরিত 'মা' শব্দ আমাদের মনের নিদারুণ শোকানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে—সেই ভাষা, আমাদের চির-প্রিয় সেই বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাসাগরের অমরতুলিকাস্পর্শে নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে। অধিক কি, তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে অতি সুমার্জ্জিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গভাষাকে এইরূপ গঠন করাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। * * *

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের * * ঔদাসীন্যকালে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ফলহীন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র অরণ্য ও কণ্টকে আবৃত; চতুর্দ্দিকে নীরসতা ও অনুর্ব্বরতার লক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিয়া অরণ্যওআদি পরিষ্কৃত করিয়া তথায় ফলবান বৃক্ষাদি বপন করিয়া, সেই মরুসদৃশ কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশকে একটী সুন্দর উদ্যানে পরিণত করিলেন। তিনি অমূল্য সুন্দর কোষাগার হইতে অতি মূল্যবান সুন্দর ভাবরত্নমালা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপে ব্যবহার করিলেন। এই অপূর্ব্ব অলঙ্কার নির্ম্মাণে, তাঁহার কারুকার্য্য ও দক্ষতা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইল। তিনি হৃদয়গ্রাহী নূতন বঙ্গগদ্য সৃষ্টি করিলেন।" ‡

‡ বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী—যতীন্দ্রনাথ বসু।

বাস্তবিক বিদ্যাসাগরের ভাষা পূর্ব্বেকার ভাষা অপেক্ষা মধুর এবং প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী এবং সারগর্ভ। তাঁহার প্রথম রচনা বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে)। "এইরূপ সুমধুর পদ বিন্যাস, ভাষা ও ভাবের সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় নাই। রচনা বিষয়ে বেতাল সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।" পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"একমাত্র বেতাল পঞ্চবিংশতির দ্বারাই ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের সুদৃঢ় উন্নতিমূল স্থাপিত হইল। তখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবকাল; তখনও লোকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পারিত না, সুতরাং ইহা দৃঢ়তাসহকারে বলা যাইতে পারে যে, বেতালের তাললয়—সংযুক্ত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষার দ্বারাই সুন্দর বঙ্গগদ্যের আদর ও উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হইল। বেতালে একদিকে যেমন শব্দবৈচিত্র্য অপরদিকে তদ্রূপ প্রাঞ্জলতা ও সুললিত ভাবমালার সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বেতাল প্রকাশের সহিতই বঙ্গগদ্যসাহিত্য সম্পূর্ণ এক নূতন দিকে ধাবিত হইল। * * * বেতালে ভাবের আদিত্ব নাই, কিন্তু ইহাতে যে লালিত্য, যে বর্ণনা বৈচিত্র্য এবং সুমধুরতা আছে, তাহা তাঁহার স্বরচিত এবং তজ্জন্যই বেতাল সাধারণ লোক কর্ত্তৃক এতদূর আদৃত হইয়াছিল।"

তাঁহার 'জীবন-চরিত' বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম রত্ন। তিনি বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব দেখিয়া 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৯), 'বোধোদয়', শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। "শকুন্তলার সমাগমে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব্ব

ধারণ করিল। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদয় দেখা দিল। শকুন্তলায় তাহার লিপিচাতুর্য্য রচনা-মাধুর্য্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠকমাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গদ্যে মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৬২ সালে সীতার বনবাস প্রকাশিত হয়। "অনুবাদের ছায়া পড়িলেও ইহাকে একপ্রকার মূলগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের বিষয়গত মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার না হইলেও, ভাব ও ভাষা বিষয়ে তিনিই ঐরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের পথপ্রদর্শক।" তাঁহার সীতার বনবাস দেখিয়া পরবর্ত্তী লেখকেরা রামায়ণাদি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বিষয় ও বস্তু লুণ্ঠন করিয়া 'রামবনবাস', 'রামের বনগমন', 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রভৃতি বহুপুস্তক রচনা করিয়া বিপুল খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। সীতার বনবাস সাহিত্য জগতে ও গৃহস্থের গৃহে এক দুর্লভরত্ন। জানকী চরিত্র হিন্দুমহিলার চিরদিনের আদর্শ চরিত্র। সেই জানকী চিত্র বিদ্যাসাগরের অমর-তুলিকা-সাহায্যে বঙ্গভাষায় চিত্রিত হওয়াতে বাঙ্গালার নারীনর সকলেরই পাঠের সুবিধা হইল। সীতার মত স্বামী-ভক্তিপরায়ণা রমণী অন্য কোন জাতির সাহিত্যে দেখা যায় না। মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী, রাজর্ষি জনকের দুলালী কন্যা, চতুর্দ্দশবৎসর বন-বাসের পর গৃহ-প্রত্যাগতা, আসন্নপ্রসবা জানকী—সেই জানকীর চরিত্রগত অপবাদ লোকমুখে শ্রবণমাত্র, রাজা নির্ব্বিচারে তাঁহাকে একেবারে বনবাসে পাঠাইলেন। তখনও কিন্তু সীতার পতিভক্তি অচলা, তখনও সীতা বলিতেছেন—

কল্যাণ বুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফুর্জথুর প্রসহ্যঃ॥

* * *

সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্ট দৃষ্টি-
রুর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রযোগঃ॥

এ সীতার কাহিনী শুধু বিষাদ কাহিনী, শুধু চির নির্ম্মল, চিরপবিত্র ত্যাগের কাহিনী; ইহাতে ভোগের গন্ধ নাই, বিলাসের লেশ নাই। এই অপূর্ব্ব সতীচিত্র মহর্ষি বাল্মিকী তাঁহার অমৃতবর্ষিণী তুলিকা সাহায্যে চিরজীবন্ত করিয়া গিয়াছেন। সীতার চিত্র আজিও বাঙ্গালীর গৃহের আদর্শ স্ত্রীচিত্র। এই চিত্রই আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর অন্তঃপুরকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিয়াছে। বিজাতীয় সভ্যতার বিলাসকলাপূর্ণ স্রোতের ঢেউ বার বার আমাদের অন্তঃপুরে আঘাত করিয়াও আজ পর্য্যন্ত আমাদের এ আদর্শ রমণীচিত্র ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া উক্ত জানকীচিত্রের উপর যে সমস্ত ধূলিকণা সঞ্চিত হইয়াছিল আমাদের শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের পবিত্র ব্যজনে সেই ধূলিরাশি অপসারিত হওয়ায় মা জানকীর 'বহ্নৌ বিশুদ্ধা' পবিত্র মূর্ত্তি প্রত্যেক বাঙ্গালীর চিত্তপটে আবার যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাই আজ আমাদিগের বাঙ্গালীর গৃহের প্রত্যেক মহিলাকে বলছি—এসো মাতা, এসো ভগ্নি, এসো কন্যা,—এসো ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শুদ্ধান্তঃকরণে

একবার এই রাজনন্দিনী, রাজস্নুষা, রাজমহিষী সীতার চিত্রের দিকে তাকাও, ঐ শোন—রাজ্যের পালনকর্ত্তা, নিজ জীবিতেশ্বর কর্তৃক নিবিড় অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হইয়াও, তিনি বলিতেছেন, তিনি তোমাদের শিক্ষা দিতেছেন—

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্ব্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥

*   *   *

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

*   *   *

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

*   *   *

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥

এইজন্যই পূর্ব্বোক্ত যতীনবাবু সীতার বনবাসকে বিদ্যাসাগরের 'গৌরব নিশান' আখ্যা দিয়াছেন। আবার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন "বিদ্যাসাগর রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে 'কান্নার জোলাপ' কহে।" এখনও অনেকে স্ব স্ব গৃহের মহিলাগণকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'মডেল ভগিনী' বা 'ঘরে বাইরে' পড়িতে না দিয়া 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' সাদরে পাঠ করিতে দিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগরের রচনানৈপুণ্যের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি যে তুলিকা সাহায্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস

প্রভৃতি রচনা করিয়া ভাষার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই তুলিকা দিয়াই ‘বিধবা বিবাহ’, ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না’ প্রভৃতি সামাজিক ও স্মৃতি বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ রচনাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন,—আবার সেই তুলিকা দিয়াই সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি রচনাদ্বারা বালকদিগের জন্য বাঙ্গালা শিক্ষার সোপান চিরদিনের জন্য তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। শুধু বর্ণপরিচয় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভূত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে সাধারণ লোকের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তেমন চর্চ্চা হইত না। তাহার কারণ, তখন শিশুগণের শিক্ষার উপযোগী তেমন ভাল পুস্তকই ছিল না। বর্ণপরিচয় প্রকাশ করাতে লোকের সে অভাব বিদূরিত হইল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বিদ্যাসাগরের রচনায় তাদৃশ মৌলিকতা নাই। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি আংশিকভাবে অনুবাদ হইলেও উহাতে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগরের আরও অনেক গুণ ছিল। তাঁহার অসীম দয়া দেখিয়া সে সময়ে সকলে তাঁহাকে ‘দয়ার সাগর’ বলিতেন। উপরন্তু বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্যের আর এক বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় বিরাম যতির ব্যবহার ছিল না। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরাম যতির ব্যবহার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন লেখকেরই রচনায় , ; : ! ? প্রভৃতি যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। ইহারও নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ পরিমাণে ঋণী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অন্যান্য সৎকার্য্যের দ্বারা নিজেকে যশস্বী না-ও করিতেন, তথাপি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তিনি মৌলিকভাবপূর্ণ পুস্তক অধিক প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু কেবলমাত্র অনুবাদ ও ভাব-সংগ্রহের দ্বারা তিনি বঙ্গভাষাকে এমন পরিমার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেরূপ পারেন নাই, ভবিষ্যতে কেহ পারিবেন কি না সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে। * * প্রকৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি কেবল স্বদেশীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে নহে পরন্তু বিদেশীয় ইংরাজী সাহিত্য হইতেও ভাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশীয় সামাজিক কুরীতির বিনাশ মানসে বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

আরও তিনি যে সময় সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, সে সময় বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্ত্তনের সময়। * * * সাধারণ লোকে—এমন কি বিদ্বান লোকেও ইংরাজী শিক্ষার দিকে এতদূর আকৃষ্ট ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তন্নিবন্ধন এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে, তৎকালে পুরাতন সংস্কৃত ভাষা বা মৌলিক বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। * * * তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা লইয়া তিনি শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিলেন; হিন্দি হইতে বেতালপঞ্চবিংশতি ও ইংরাজী হইতে বঙ্গের ইতিহাস, বোধোদয়, ভ্রান্তিবিলাস, কথামালা ইত্যাদি রচিত হইল। * * * হইতে পারে, স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বঙ্গগদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু বর্ত্তমান কালের 'বিদ্যাসাগরী ভাষার'

সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। * * * তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের ঠিক পিতৃসদৃশ না বলিলেও তাঁহাকে ইহার পরিপোষণকর্ত্রী মাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বর্ত্তমান সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল অবস্থা।

প্রায় সকল দেশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে নিপুণ উৎকৃষ্ট লেখক কখন কোন দেশে একা দেখা দেন না। ইংলণ্ডেও Golden age of English Literature ছিল; গ্রীস রোমেও তাই। সংস্কৃতে বিক্রমাদিত্যের সময়ও তাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে, দেখিতে গেলে, বিদ্যাসাগরের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত কালকে Golden age of Bengali Literature বলা যাইতে পারে। কারণ. দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু পরে পরেই অনেকগুলি সাহিত্যরথী বিভিন্ন বিষয় লইয়া বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সাধারণ গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ লইয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, ধর্ম্মমূলক ও ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি, ধর্ম্ম গ্রন্থানুবাদ ও সামাজিক বিদ্রূপাত্মক রচনা লইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লইয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি, প্রত্ন-তত্ব লইয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি, পদ্য-কাব্য, নাটকাদি ও সামাজিক শ্লেষাত্মক কবিতাদি লইয়া মাইকেল দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি, ভাষা-তত্ব লইয়া রামগতি ন্যায়রত্ন, গভীরভাব ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্রূপাত্মক সামাজিক সমালোচনা লইয়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি এবং সর্ব্ববিষয়িণী রচনার ডালি লইয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার চরণকমলে অর্চ্চনাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

যেমন কোন রমণীর গাত্রের রং শুধু গৌরবর্ণ হইলে হয় না, চোক মুখের গড়ন ভাল চাই, কাপড়চোপড় চাই, উপরন্তু গা সাজানো অলঙ্কারাদিও চাই;—তবে সে রমণীকে অনিন্দ্যসুন্দরী দেখাইবে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যে সব সাহিত্যিকের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত তিনি সেই বিষয়ক রচনারূপ অলঙ্কারাদি লইয়া বঙ্গভাষা-সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে যথাবিধি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন; ফলেআমরা বঙ্কিমের সময়ে বঙ্গভাষার অনিন্দ্যসুন্দরী মোহিনীমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমরা বিদ্যাসাগরের যুগের উল্লিখিত সাহিত্যসেবিগণের বিষয়ে সংক্ষেপে অনুশীলন করিব।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়(১৮২০-১৮৮৫)—

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম; ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, গীতমঞ্জরী, আত্মজীবন-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ নাটককার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার সুযোগ্য পুত্র। ইঁহার ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত বাঙ্গালা ভাষায় এক মূল্যবান পুস্তক। ইহাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মহারাজ মহাতাব চান্দ (১৮২০-১৮৭৯)—পরম সাহিত্যা-মোদী বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মহাতাব চান্দ বাহাদুর তাঁহার সভাপণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মুখে মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অভিলাষী হন, এবং

অবিলম্বে তজ্জন্য পণ্ডিতমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য এই অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার এই বিরাট সদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। "বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে কেবলমাত্র মহাভারত নহে, হরিবংশ এবং রামায়ণের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর এ কীর্ত্তি এ দেশে চির প্রতিষ্ঠিত রহিবে।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৪)—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—নীতিসার দুইভাগ, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, ভূষণসার নামে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি সোম প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় সুপদ্ধতিক্রমে ও সুরুচি সহকারে সংবাদ পত্র প্রচার-প্রথা ইনি প্রথমে দেখাইয়া দেন।" ‡ সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। * * * 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয়মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই।" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জন্মদাতা। এজন্য এদেশের লোক চিরদিন ইহার নিকট ঋণী থাকিবেন।" ‡

‡ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০–১৮৮৬)—দরিদ্রের সন্তান অক্ষয়কুমার দত্ত বলবতী জ্ঞানপিপাসা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করতঃ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সংসাধন করেন। পরে দেখিব—৺রজনীকান্ত গুপ্তও অক্ষয়কুমারেরই মত দারিদ্র্যের সহিত আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া সাহিত্য পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত চারুপাঠ তিনখানি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শিক্ষার জিনিষ, অক্ষরজ্ঞানের ভাণ্ডার। ভাষা হিসাবে বালকের নিকট জ্ঞানপ্রদ, বিজ্ঞানতত্ত্ব হিসাবে সকলের শিক্ষার জিনিষ। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, গবেষণাকৌশল ও বিচার নৈপুণ্য, তাঁহার রচনাও তদ্রূপ ওজস্বিনী, গাম্ভীর্য্যময়ী ও চিত্তচমৎকারিণী। "তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব্ব ভাবরাশিতে সজ্জিত করিল। তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতি তাঁহাকে যত্নসহকারে আপনার কার্য্যকারণ পরম্পরার সহিত সুপরিচিত করিয়া দিল; তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিন্তনে অগ্রসর হইলেন, অতীত যেন বর্ত্তমানের ন্যায় সমুজ্জ্বলভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল; তিনি নানাবিষয়ে উপদেশ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় অবলীলাক্রমে তাঁহার মানসপথে উদিত হইতে লাগিল।" ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, পুরাবৃত্ত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সন্তোষবিধায়িনী রচনা লিখিয়া তিনি পাঠকবর্গের চিত্ত-চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয় তখন

শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই—গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিন্যাসচাতুরী ও সর্ব্বোপরি সেই দীপ্তিময় বহ্নিস্তূপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে। * * * অক্ষয়কুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানগুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েই নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। * * বিজ্ঞানের নিগূঢ়তত্ত্বের নিরূপণ, তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদের মধ্যে পরিগণিত ছিল।"

এক্ষণে বাঙ্গালাভাষায় ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সরল মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ে কতই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে অক্ষয়কুমারই এই ধরণের পুস্তক প্রথমে লেখেন। ইঁহার প্রথম রচনা বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দুইভাগ; তৎপরে চারুপাঠ তিনভাগ। শেষ জীবনে অক্ষয়বাবু ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুইভাগ উল্লেখযোগ্য; উহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাধীন গবেষণা অনুসন্ধিৎসা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকের মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার সমধিক ভক্তি বা আস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমারের রচনা হইতে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অনাদরের সামগ্রী নয়, ক্ষমতাবান লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তিবিকাশ করিতে পারে। * *

বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সমবেত যত্নে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগে অর্থাৎ গদ্যাংশে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছিল।"

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, অক্ষয়কুমারকে পাইয়া বঙ্গভাষা সগর্ব্বে বলিতে পারিতেন—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার,
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার।

শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'বঙ্গবাণী'তে লিখিয়াছেন: "বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই [প্রথম] বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত আদর্শে সুমার্জ্জিত এবং সুগঠিত করিয়া আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২১-১৮৯১)—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি, আই, ই—প্রাকৃতিক ভূগোল, শিল্পিকদর্শন, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণ প্রবেশ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী, রহস্যসন্দর্ভ ও বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে এক্ষণে এত আগ্রহ, এত যত্ন দেখা যাইতেছে রাজেন্দ্রলাল তাহার পথপ্রদর্শক। প্রত্নতত্ত্বালোচনা বিষয়ে ইনিই অগ্রণী, ইনিই প্রথম উৎসাহদাতা।

কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২-১৮৯২)—কৃষিবিদ্যা বিষয়ে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া আদর্শ উদ্যান স্থাপন করিয়া ইনি পাশ্চাত্য

প্রণালীতে কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। ইনি বিধবা বিবাহ, কৃষি-বিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদক নিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত ইহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)—মাইকেল মধুসূদন ইনি এইযুগের একজন অসাধারণ প্রতিভাবান লেখক। গদ্যসাহিত্যে যেমন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার নূতন যুগের সৃষ্টি করেন, পদ্যসাহিত্যে সেইরূপ মাইকেলও এক অপূর্ব্ব নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। অবশ্য, ইহার জন্য কবিকে প্রথম প্রথম প্রভূত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কাব্য বা পদ্য-সাহিত্য আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে, মাইকেলের নাম এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিবার দুইটী কারণ আছে; প্রথম, তিনি যে নব-যুগের সৃষ্টি করেন তাহা শুধু বাঙ্গালা পদ্যসাহিত্যের বা কাব্যের নহে, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের। 'প্রদানিল', 'উত্তরিল', 'মর্ম্মরিল', 'নির্ম্মিল', 'পীড়িল', 'স্বনিল' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করেন। ইহার জন্য তাঁহার উপর চারিদিক হইতে যথেষ্ট শ্লেষোক্তি বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময় মৌনভাবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। প্রতিভাবান লেখকমাত্রেই কিছু না কিছু নূতনত্ব আমদানি করেন যাহার জন্য তাঁহাকে পরে শ্লেষোক্তিবর্ষণ মাথা পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু প্রতিভাবান লেখক সে শ্লেষোক্তি গ্রাহ্য করেন না। রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট তীব্র শ্লেষোক্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আদর্শভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ 'হেক্টর বধ' (১৮৭০) নামে তাঁহার একখানি গদ্যগ্রন্থও ছিল; তবে এখানিতে তাঁহার লেখক বা সাহিত্যিক নামের গৌরব বৃদ্ধি না করিয়া বরং হ্রাস করিয়াছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এ খানিকে একখানি 'সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, 'গদ্য রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগী ছিল না।' তবে ইঁহার নাম বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই নিমিত্ত যে, এই মাইকেল এককালে 'পৃথিবী' শব্দ শুদ্ধভাবে লিখিতে অসমর্থ হইয়া সহাধ্যায়ী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (বাঙ্গালা ভাষার উপর অবজ্ঞাচ্ছলে সাহেবী ঢঙে) বলিয়াছেন 'Oh no, it must be প্র—থি—বী'; এই মাইকেল বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠিলেই সাতিশয় অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল"; আর এই মাইকেল উত্তরকালে এমন 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছিলেন—

'গৌড়জন যাহে
আনন্দে [করিছে] পান সুধা নিরবধি'

আবার এই মাইকেলই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এই সনেট রচনা করিয়াছিলেন—

'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
* * * পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখনি, পূর্ণ মণিজালে।'

এ পরিবর্ত্তন কি অভাবনীয় নয়? পূর্ব্বোক্ত বাবু কুমুদনাথ দাস লিখিয়াছেন—"Before his death, he wrote a Bengali prose translation of Homer's Iliad and a half finished Bengali drama—Mayakanana—which bear marks of a completely spent-up genius. * * * It is in Madhusudan's writings that we first meet with that virile aud all-round influence of the Western Literature upon the Eastern, an influence which has shaped the destiny and guided the tendencies of the Bengali language and has been instrumental in its phenomenally rapid development."

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (১৮২৫-১৮৮৬)—প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী পড়াইতেন এবং তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পরি ভাষায় পাটীগণিত ও বীজগণিত লিখিয়াছিলেন। গণিত বিষয়ক বাঙ্গালা পরি ভাষা ব্যবহারে ইনিই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক। গণিত, জ্যোতিষ এবং ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)—ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি মাইকেলের সহাধ্যায়ী। শিক্ষিত বংশেই ইঁহার জন্ম; বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধা ও দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি সারাজীবন শিক্ষাবিভাগেই অতিবাহিত করেন এবং উত্তরকালে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিনি যৎকালে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ছাত্রদিগের পাঠের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি তৃতীয় অধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি রচনা করেন।

শিক্ষাবিভাগে সারাজীবন কাটাইয়া তিনি যে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' অনুবাদের ছায়া পড়িলেও উহাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে ইতিহাসোক্ত ঘটনার ব্যত্যয় ঘটিলেও উপন্যাস হিসাবে বড় সুন্দর হইয়াছে। যে উপন্যাসরাশি রচনা করিয়া বঙ্কিমবাবু অতুল যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ভূদেবের এই উপন্যাস সেই শ্রেণীর প্রথম উদ্যম হইলেও সফলকাম হইয়াছে—বলিতে হইবে। ইহাতে বর্ণিত দিল্লীর প্রাসাদ, সাজাহানের ময়ূর সিংহাসন, শিবাজীর স্বদেশ-প্রীতি আওরঙ্গজেবের ধূর্ত্ততা, রামদাস স্বামীর শিষ্য-বাৎসল্য, বিশেষতঃ সম্রাট-নন্দিনী রোশীনারার 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' চিত্র—বঙ্কিমের চিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এতদ্ব্যতীত ভূদেব পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে কয়খানি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর সমালোচনা দেখিতে পাই। "সাহিত্য ক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ। তিনি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার, ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনা বৈচিত্র্য পরিস্ফুট

হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্য সংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন ও ভূদেব দুই জনেই হিন্দু সন্তান, দুইজনেই সমসাময়িক, দুইজনেই সহাধ্যায়ী এবং দুইজনেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন; কিন্তু একই শিক্ষার যে একই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে ফলের ইতর বিশেষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধুসূদন যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন; মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ভূদেব তাহার আকর্ষণে স্খলিত পদ হ'ন নাই। মধুসূদন জাতীয়ভাব পদদলিত করিয়াছেন; ভূদেব জাতীয় ভাবের প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। একের প্রতিভা বিজাতীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য. চিরপ্রসিদ্ধ চরিত্রের হীনতা ঘটাইয়াছে; অপরের প্রতিভা স্বদেশের বিশ্বজনীন উদার ভাব নিচয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে।" কুমুদ বাবু বলিয়াছেন He might well be called the Addison of Bengal.

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)—

রাজনারায়ণ বসু মাইকেলের পরম বন্ধু ছিলেন। ইতি ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সেকাল আর একাল, হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, আত্মচরিত, গ্রাম্যোপাখ্যান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার দ্বারা সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্য যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর—কবি বা নাটককার বলিয়া বিশ্রুত

হইলেও, ইহার কিঞ্চিৎ গদ্য রচনাও আছে; সেই স্বল্প গদ্য রচনা হিসাবেই এ প্রবন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল। মাইকেলের গদ্যরচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেও ঠিক তাহা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধু যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর প্রভৃতি গদ্য উপন্যাসগুলি না লিখিলে বোধ হয় ভালই হইত। স্থানে স্থানে উৎকট সমাস ভারে নিপীড়িত তাঁহার গদ্য রচনাগুলি আমরা বিশেষ প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য মনে করি না তবে তিনি সমাজ-সংস্কার কল্পে যে চাবুক উত্তোলিত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তৎকালে মহদুপকার সংসাধিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু খুব রসিক লোক ছিলেন। "তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক খোসগল্প সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেইগুলি পুস্তক মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেরূপ করায় অনেক স্থলেই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই।" ইহার রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার দোষগুণ খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালাভাষায় বিরল।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০-১৮৮৫)—

তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা রচনা করিয়া হেয়ার সাহেবের Prize Fund হইতে পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ১৮৫৪ সালে কাদম্বরী ও ১৮৫৯ সালে রাসেলাস—এই দুই খানি দুই ভাষার অতি কঠিন পুস্তককে—অতি যোগ্যতার সহিত সুললিত বাঙ্গালায় অনূদিত করেন। ইঁহার কাদম্বরী সীতার বনবাসের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শোভাবাজারের বিদ্যোৎসাহী রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরও জনসনের রাসেলাসের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)—

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮), বস্তু বিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগ (১৮৫৯), রোমাবতী (১৮৬২), দময়ন্তী (১৮৬৯), মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ (১৮৭২), রামচরিত (১৮৮১), নীতিপথ (১৮৮২), বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আজকাল দীনেশবাবু প্রমুখ লেখকগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; কিন্তু রামগতির এ গ্রন্থ অনেক আগেকার; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ভাষা ও সাহিত্যামোদিদিগের নিকট ইহা একখানি বড় মূল্যবান পুস্তক; ইহার রচনা-প্রণালীও বিশেষ প্রশংসনীয়। অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইলেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই পুরাতন গ্রন্থ আজিও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পণ্ডিত রামগতির মৃত্যুর পর ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, এই পুস্তকের কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া নূতন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন।

যে সময়ে ভারতবর্ষের ভাল ইতিহাসের অভাব দেখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন, ইহার পরে ইনি গোষ্ঠী কথা রচনা করেন। অতঃপর ভূদেব বাবুর উৎসাহে সংস্কৃত মহাবীর চরিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; পুস্তকখানির নাম দেন রামচরিত, এবং ভূদেব বাবুর নামেই উৎসর্গ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিশুপাঠ্য নীতিপথ রচনা করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙ্গালায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন; সেখানির নাম "ইলছোবা" বা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান। পুস্তকখানি উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমের কোন উপন্যাসের সমতুল না হইলেও, ইহার ভাষা "প্রাঞ্জল ও বিশদ"।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক (১৮৩২—?)—ইনি রণজিৎসিংহের জীবনী, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতি লিখিলেও, ব্রহ্মমোহন বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতি শাস্ত্র বিষয়ক অনেক নূতন সুষ্ঠু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—যাহা তাঁহার দ্বারাই প্রথম উদ্ভাবিত হয়।

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)—

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের অগ্রজ; ইঁহার রচনা মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, জালপ্রতাপ চাঁদ, পালামৌ, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী প্রভৃতি। ইঁহার রচনা বঙ্কিমের তুল্য না হইলেও নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩৫-১৮৯০)—

তখনকার দিনে ধনী লোকেরা বিদ্যাশিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ ধনীর সন্তান হইয়াও শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, সাহিত্যামোদীও ছিলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে ও বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং বিদ্বজ্জন মণ্ডলীকে তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের স্বনামধন্য স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব ব্যতিরেকে ইতিপূর্ব্বে কেহ শিক্ষা বিস্তার বিকল্পে

ঈদৃশ বহু অর্থ ব্যয় ও বিপুল কষ্ট স্বীকার করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্নের মহাভারতই মূল সংস্কৃত মহাভারতের সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক অনুবাদ। "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার এ কীর্ত্তি চিরোজ্জল রহিবে।" এতদ্ব্যতিরেকে কালীপ্রসন্নের হুতোম পেঁচার নক্সা তৎকালীন সমাজের একখানি উৎকৃষ্ট নক্সা। ইহার দ্বাদশ গোপাল প্রভৃতি যিনি একবার মাত্র পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সাহিত্য রচনাশক্তির অনুশীলন করিতেছি, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বা অন্য মনোবৃত্তির নহে। ইনি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটক নিজে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিজ বাড়ীতে প্রথম অভিনয় করান। বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৮৯)—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সমুচ্চয়ের যথাযথ বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গ ভাষার পরিপুষ্টি সংসাধন করেন। অধুনা বঙ্গ ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে;—ইনিই তৎসমুদয়ের পথ প্রদর্শক। ইহার চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড—চিকিৎসা বিষয়ে বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ; ইঁহার অন্য রচনা শারীর বিদ্যা, মাতৃশিক্ষা ইত্যাদি। বঙ্গের গৌরব সরস্বতীর বরপুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইঁহারই পুত্র।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০)—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের বক্তৃতা, ৫ ভাগ,

কুসুমাঞ্জলি, চন্দ্রবংশ চন্দ্রালোক, উদ্বাহ চন্দ্রালোক, শুদ্ধি চন্দ্রালোক, শিক্ষা প্রভৃতির রচয়িতা।

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৭-১৯১৭)—চন্দ্রশেখর বসু প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, বেদান্ত প্রবেশ, বেদান্ত দর্শন, সৃষ্টি, অধিকার তত্ত্ব, বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি, হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ প্রভৃতির রচয়িতা। বাঙ্গালায় আধ্যাত্মিক বিষয় রচনার জন্য ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ইঁহার সমস্ত পুস্তকই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক। এই সকল গ্রন্থ বিস্তর রাজা, মহারাজা, জমীদার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য ভদ্রলোককে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

হরিমোহন প্রামাণিক (১৮৩৮-১৮৭৩)—

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ শীর্ষক একখানি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)—

বাঙ্গালা ভাষায় কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি ভক্তিরসাপ্লুত। 'বিধান ভারত', "নবসংহিতা", 'জীবন বেদ" 'সেবকের নিবেদন' প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের রচনা; এতদ্ভিন্ন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার' নামক দুইখানি সাময়িক পত্রের ইনি প্রকাশক। ইনি 'অশোক-চরিত' নামে একখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্কিমের সমসাময়িক ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কারিদিগের একজন অগ্রগণ্য।" ‡

‡ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)—

এইবার আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের বিষয় অনুশীলন করিব। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের পর সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী,—কবিতা, সাধারণ সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন. পুরাণ, উপন্যাস—এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া বঙ্কিম কিছু না কিছু রচনা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত 'বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "ঈশ্বর গুপ্ত যে গদ্য প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা প্রাণশূন্য, বলশূন্য। তাঁহার কবিতার ন্যায় সে ভাষা আড়ম্বর অনুপ্রাসভারে পীড়িত, শব্দের শৃঙ্খলে বদ্ধ, অপরিস্ফুট, বেগশূন্য। প্রথম অভাব ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মোচন করিলেন। গদ্যে প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা জন্মিল। আর একদিকে অক্ষয় কুমার দত্ত ভাষার এই গুরুতর অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুইজন লেখক অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু অনুবাদেই তাঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যবসিত হইল। মৃণ্ময়ী প্রতিমা গঠিত

হইল মাত্র; প্রতিমার অলঙ্কার, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সমস্তই অবশিষ্ট রহিল। প্যারীচাঁদ মিত্র কতক পরিমাণে ইহা জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার পর এই উভয় কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত সম্পাদিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। ভাষার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যে মহামূল্য অলঙ্কার পরাইয়াছেন তাহার তুলনা কোথায় হইবে? ব্রাহ্মণ কুলতিলক বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পৌরহিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতর ব্যক্তি কে? বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে বঙ্গসাহিত্যে বিচিত্র বিপ্লব উপস্থিত হইল। সাহিত্যের পল্লী সহসা বিস্তৃত হইয়া সাহিত্যের রাজ্যে পরিণত হইল, দগ্ধ মরুভূমে শীতল সলিলা কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী বহিল। দরিদ্রের কুটীর সহসা ধনধান্য মণিমুক্তা পরিপূর্ণ হইল। সমগ্র শিক্ষিত বঙ্গবাসী সেই অভিনব আনন্দপূর্ণ রাজ্যের প্রজা হইল। সকলে একবাক্যে হর্ষজয়ধ্বনি করিয়া বঙ্কিমের শিরে রাজমুকুট পরাইল। * * তিনি জানিতেন সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, অযোগ্য ব্যক্তির ক্রীড়া কৌতুকের নহে। ভাবের, ভাষার উৎস মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং প্রহরী হইয়া দাঁড়াইলেন; পাছে কেহ সেই নির্ম্মল সলিল আবিল করে। সেই সলিলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ উৎপাদিত করিল। বঙ্গবাসী বিস্মিত, মুগ্ধ, আনন্দিত হইয়া সেই প্রবাহ এবং সেই বর্ণ বৈচিত্র্য দর্শন করিতে লাগিল।

বঙ্গ ভাষার স্তরে স্তরে যে রূপরাশি এতদিন লুক্কায়িত ছিল বঙ্কিম একে একে তাহা উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন। ভাবের অভাবে যে ভাষা মৃতপ্রায় ছিল ভাব প্রাচুর্য্যে তাহা সৌভাগ্যশালিনী হইয়া উঠিল।

যে ভাষা নিরর্থ শব্দভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল সেই ভাষা ছন্দোময়ী, আবেগময়ী হইয়া উঠিল। মহামহিমাময়ী প্রতিভা, অপূর্ব্বসৃষ্টি-কুশলী কল্পনা বঙ্গভাষার অভাব মোচনে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নিযুক্ত হইল। মহাশক্তিশালী ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে ভাষায় মোহমন্ত্র বিরচিত হইল। যেমন বেগ তেমনি সংযম, যেমন তীব্রতা তেমনি কোমলতা, যেমন মাধুর্য্য তেমনই গাম্ভীর্য্য। কে জানিত এই সঙ্কীর্ণ দরিদ্র ভাষায় এত বল এত বৈচিত্র্য ছিল! পল্বলের গোষ্পদের স্থায় সঙ্কীর্ণভাষা সমুদ্রগামিনী পূর্ণ প্রবাহিণীর স্থায় সহস্রমুখী হইয়া নানাতরঙ্গভঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়ের নির্জ্জন প্রদেশে কোথায় একতারা বাজিতেছিল, সহসা একেবারে সপ্তস্বরা বীণা বাজিয়া উঠিল। * * এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা বঙ্কিমের লেখনীর মুখে শাণিত অসির তীক্ষ্ণতা, বজ্রবিদ্যুতের বলধারণ করিয়াছে। তর্কে, সমালোচনায়, এই তীব্র তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। একমুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া পুরাকালে সমরাচার্য্য যেরূপে শত্রু নিবারণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপে সংক্ষেপে অবলীলাক্রমে সাহিত্যসাধনক্ষেত্র হইতে ভণ্ড অক্ষমকে খেদাইয়া দিতেন। তাঁহার হস্তে ব্যঙ্গ বজ্র হইয়া উঠিত।" ‡

তিনি আরও বলিয়াছেন "প্রতিভা কিরূপ বলবতী হইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত। কোমলতা গভীরতা তন্ময়তা বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন বলবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বলে বঙ্কিম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে চরিত্র গঠনে অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে এই বল সর্ব্বত্র

‡ ভারতী—আষাঢ়, ১৩০১

জাগিয়া রহিয়াছে। এই বলে তাঁহার করুণা এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রেম এত বলবান, পরোপকার এরূপ সর্ব্বত্যাগী। এইজন্ত কোনস্থানে তাঁহার রসভঙ্গ হয় নাই, কুত্রাপি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই। মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে সুরে বাঁধা থাকিত, যখন যে তারে অভ্রান্ত সিদ্ধ হস্তে আঘাত করিতেন, সেইরূপ প্রতিশব্দ হইত। এই জীবনব্যাপী সাধনা ও একাগ্রতায় তিনি কদাপি আত্মবিস্মৃত হন নাই, মুহূর্ত্তের জন্ম তাঁহার বলদৃপ্ত প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নাই। আড়ম্বরের লেশ নাই, ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা আছে। ভাবে, যুক্তিতে, রসিকতায়, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্র আদর্শ মিলন। কোথাও আয়াস নাই, অঙ্গভঙ্গী নাই, নীরস চপলতা নাই। শব্দ বিন্যাসের অন্ধকার ঘনঘটা কোথাও নাই শ্রুতি মধুর শব্দপ্রবাহ, নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল কারুকার্য্য সর্ব্বত্র আছে। নিরবচ্ছিন্ন অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষা, অথচ শব্দলালিত্যের নিমিত্ত ভাব-গৌরব কোথাও বিনষ্ট হয় নাই। স্মরণ করিতে হইবে যে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ। কিঞ্চিৎ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যদি বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে ভাষার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। কিন্তু ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা, সর্ব্বোপযোগীতা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রত। কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সমালোচনায়, কূটপ্রবন্ধে, বিশুদ্ধ রহস্তে; ধর্ম্মের গভীর আলোচনায় তিনি এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা পরিচালিত করিলেন—দেখাইলেন কোথাও অসামঞ্জস্ত নাই, ভাষার কোন অভাব নাই। সর্ব্বত্র তিনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র অবিশ্রান্ত অপরিসীম বলবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। * * *

বঙ্কিম যখন সাহিত্যে প্রথম আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন রসিকতার নামান্তর গালি ছিল। ইতর অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়াকে লোকে কৌতুক বিবেচনা করিত। ঈশ্বরগুপ্ত ও গুড়গুড়ে যখন অশ্রাব্য ভাষায় ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন তখন লোকে আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইত। উচ্চশিক্ষার ফলে, উচ্চ আদর্শের গুণে, নির্ম্মল প্রতিভার বলে, সে দোষ বঙ্কিমকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকের গায়ে কাদা ছিটাইয়া তিনি কখন লোক হাসান নাই। বিশুদ্ধ রসিকতা প্রতিভার অতি উচ্চ অঙ্গ। বঙ্কিম পূর্ণমাত্রায় তাহা পাইয়া ছিলেন। নির্ম্মল হাস্য কৌতুক পরিহাসের আদর্শ তিনি বঙ্গসাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে রসিকতা অতি গভীর, অতি বিশুদ্ধ, যে হাসির গভীর তলদেশে অশ্রুজল লুকায়িত থাকে বঙ্কিম স্বজাতিকে তাহাই দিয়া গিয়াছেন।"

বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য-পরিচর্য্যা বিশ্লেষণ কালে বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্ক মোহন সেন লিখিয়াছেন ; "বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্যকে নিখুঁত আর্য্য-আদর্শে সংস্কৃতের অনুগত করিয়া যান। * * বঙ্কিমের প্রতিভাই অনুপম স্বভাব শীলতা এবং স্বাধীনতার গুণে, একদিকে বিদ্যাসাগর এবং অন্যদিকে প্যারীচাঁদ প্রভৃতির মধ্যপথে, প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। * *

উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। তাই বা কেন, তিনি বঙ্গদেশে এই এক নবসাহিত্য-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কপালকুণ্ডলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিভার যেই মেঘ গর্জ্জন দূর হইতে শুনা গিয়াছে, চন্দ্রশেখর বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহাই ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী

গৃহস্থের গৃহদ্বারে আসিয়া তাহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত করিয়াছে। বাঙ্গালী এই ধ্বনি ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই। *

বঙ্গীয় কথাসাহিত্যে এবং গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চির-পূজ্য আসন; * * যথোচিত ঘটনা এবং চরিত্রের সৃষ্টি, উপাখ্যানের নৈতিক ভিত্তি, ভাষার শাণিত দীপ্তি, ত্বরিত গতি এবং সর্ব্বত্র হৃদয় গ্রাহিতার গুণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী; তাঁহার ভাষা ভাব ও বস্তুবিষয় সর্ব্বত্র সুমার্জ্জিত এবং সংযত; * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিক ইংরাজী বা ইয়োরোপীয় উপন্যাসের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রকাণ্ডতা নাই; মনুষ্য জীবনের সর্ব্ববিধ ভাল-মন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে ওজস্বী কিংবা বৈচিত্র্যময় চরিত্র সমাবেশ নাই। তাঁহার উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র; বর্ণিত চরিত্র গুলিও বড় প্রকাণ্ড নহে; এবং মানব জীবনের এক একটা সরল এবং ব্যাপক ভাবকে আশ্রয় করিয়াই উহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। * * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলি এক একটা প্রেমের খেলা; দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ অথবা ব্যভিচারই প্রায় তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড। বঙ্গদেশে গার্হস্থ্য জীবন ভিন্ন জীবন; এবং গার্হস্থ্য প্রেম ব্যতীত মহত্তর বা ব্যাপকতর ভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদের সময় হইতে বাঙ্গালী এই প্রেম লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আসিতেছে; প্রেমের বিষয়েই বাঙ্গালীর প্রতিভা বিশেষ ফুটিয়াছে। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—এই বাক্য আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি, এবং অন্যকে বুঝাইতেছি। আবার, এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমধিক বিকশিত হইয়াছিল। * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলির প্রধান গুণ এই যে, উহারা রচনার বস্তুভিত্তি, গভীর আন্তরিকতা এবং সর্ব্বত্র ঋজুতার দরুণ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বঙ্কিমের রচনা প্রণালীর মধ্যেও কোনরূপ একদেশিতা বা সঙ্কীর্ণতা নাই, উহা সর্ব্বত্র আত্ম-সংযত এবং আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। * *

এই দেশের পরিবার, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইতিহাস এবং ধর্ম্ম আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বঙ্কিমের উপন্যাস এবং সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিভা এবং বঙ্গদর্শনের আহ্বান অনেক বিশিষ্টকর্ম্মা ব্যক্তিকেই প্রলুব্ধ করিয়াছিল। * * *

বঙ্কিম শেষ বয়সের উপন্যাসাদিতে এবং ধর্ম্মতত্ত্বে, দেশের বহু প্রচলিত 'একান্ত বৈরাগ্য' এবং 'সংন্যাসের' আদর্শকে বিপ্রতিপন্ন করিয়া, গীতোক্ত 'ভাগবতধর্ম্ম' এবং সেশ্বর ভক্তি আদর্শের প্রচার করিয়াছেন।"

শশাঙ্কমোহন সেন আরও লিখিয়াছেন: "রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার পদ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ওই পদ-গৌরবে বঙ্গভাষা যথেচ্ছ ভাবে চলিতে পারিতে ছিল না; * * * বঙ্কিমচন্দ্রের কথা হাসিতে, নাচিতে, ছুটিতে, কাঁদিতে জানিত; প্রেম করিতে, কলহ করিতে, যুদ্ধ করিতে জানিত; ঘৃণা করিতে, আঁস্ফালন করিতে, ভীত ও বিস্মিত শান্ত এবং স্তিমিত হইতেও জানিত; * * রামমোহন তর্ক করিতে, নিরস্ত করিতে, ধ্যানস্থ করিতে জানিতেন; কেশবচন্দ্র উদ্দীপ্ত করিতে, অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন; বিদ্যাসাগর বুঝাইতে, কাঁদাইতে জানিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইতে, দীনবন্ধু হাসাইতে জানিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র ন্যূনাধিক সমস্ত এবং তাহারও অধিক জানিতেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ গঠিত—পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে

কোন অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব, অর্থ ও ছন্দ পরস্পকে ব্যভিচরিত করে না বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধ এই সরস্বতী শ্রেষ্ঠ—কাব্যশিল্পীর উপযুক্ত। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমের আবশ্যক ছিল। * * *

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় শিল্পী; আমাদের পরম আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি কেবল ইয়োরোপীয় উপন্যাসাদর্শের অনুকরণ করিতে যান নাই। স্বকীয় অন্তঃকরণতন্ত্রের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবশে, কতকটা জাগ্রতভাবেই তিনি ইয়োরোপীয় সংশ্রব যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রণয়পূর্ব্বক বিবাহের প্রতিষ্ঠা নাই—প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দীতেও, তাই বঙ্কিম একান্তভাবে প্রণয় পূর্ব্বতার অবতারণা করেন নাই। আবার, ভারতবর্ষীয় দাম্পত্য আদর্শে পরিণয় কেবল চুক্তি নহে; এই আদর্শে ব্যভিচার করিয়া দম্পতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিশেষে পুনর্ম্মিলিত হইতে পারেন না! দাম্পত্য তন্ত্রে, যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগে না। রাণী ভবানী সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন—'স্ত্রীলোকের সতীত্ব মৃৎপাত্রের ন্যায়, ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগেনা'; জুড়িয়া দিলেও, রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্ত্তিনীর' মত সেই অতীত পাপছায়া দম্পতির মিলন মধ্যস্থলে জাগিয়া থাকে। এই তত্ত্ব নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইতে পারে; কিন্তু ইহা অধ্যাত্ম জীবনের চিরন্তন সত্য। উহাকে উপেক্ষা করার যো নাই। * *

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, শ্রেষ্ঠ পারিবারিক উপন্যাস। উহার পরিসর ক্ষেত্র ক্ষুদ্র, একটীমাত্র বঙ্গীয় পরিবার। * * কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। উহা বঙ্গসাহিত্যে

অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইংরাজি সাহিত্যেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। দাম্পত্য প্রেমের এই পরম সূক্ষ্ম আদর্শ প্রাচ্য ঋষির আবিষ্কার। * *

আনন্দমঠ গ্রন্থে স্বদেশ-প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্ম সমঞ্জসিত আদর্শ অন্বেষণ করিয়াছে। আনন্দমঠ রচনার সময় বঙ্কিমের বয়স ৪৩ বৎসর। স্বকীয় শিল্প-প্রতিভার সুবর্ণ-সুযোগের চরম রেখা তিনি অতিক্রম করিতেছিলেন। * * বঙ্কিম একদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম সংন্যাসের মধ্যেই দেশানুরাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্যদিকে, ভারতবর্ষীয় সংযম-নিষ্ঠা, উন্নত জীবন সাধনা এবং দম্পতির পরস্পর-প্রাণতার স্থির আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। * *

বঙ্কিমচন্দ্র জগতের মঙ্গলকামী দার্শনিক বলিয়া তাঁহার শিল্পশক্তি সচেতন ভাবেই সমাজের মঙ্গল মুখী। * * *

বঙ্কিমচন্দ্র কবি; গদ্যের ক্ষেত্রে লেখনী পরিচালন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার রচনায় কবিত্ব শক্তি—কল্পনী, দাপনী ও রসনী শক্তি—অসাধারণ! তাঁহার ভাষা এবং রচনারীতি সর্ব্বত্র ঋজু, সংযত, সংহত অথচ ভাবার্থের প্রকাশে ত্বরিতশক্তিমতী; প্রচলিত অথচ গৌরবান্বিত; অমায়িক অথচ গভীর! তাঁহার গদ্যপ্রবাহে সময় সময় ভাবোচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের সুর পাওয়া যায়; অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা, এই গদ্য! * *

এখন যাহারা সরস্বতীর অন্তঃপুরে 'উকি দিয়া' দেখিবার সৌভাগ্যও পায় নাই, তাহারাও বিশত্রিশ খানি তিন বলুম নবেল লিখিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অর্থ অর্জ্জন করিয়া যাইতেছে অবশ্য সারস্বতী খ্যাতি কিংবা শিল্পীর 'পরমার্থ' নহে। এইরূপ এক একটী নবেলের পাঠ শেষ করিয়া, চিন্তা করিলেই দেখিবেন—হয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পরম নিবিষ্ট ভাবেই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হইয়াছিল; উহা যেন কয়েক

ঘণ্টাকাল মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবৎ আবিষ্ট রাখিয়া ছিল ! কিন্তু উহার মধ্যে এমন একটা শব্দ, একটি পংক্তি, একটা দৃশ্য নাই, যাহা মনে মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে ! সমস্ত গ্রন্থ একটি ক্ষণ প্রদীপ্ত উল্কা-জ্বালার মতইইন্দ্রিয়-পথে বিস্ফুরিত হইয়া নিবিয়া গিয়াছে ! * ঐ গ্রন্থের কিছুমাত্র সারস্বত আকর্ষণ নাই ; * * উহা 'মস্তিষ্কের অহিফেন' ব্যতীত আর কিছুই নহে। * *

ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকৃত কবিত্বশক্তি লইয়াই উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ গল্প কথকের ন্যায় কেবল ভূয়োদর্শন, পুঞ্জীকরণ বা আমোদনের প্রণালীই তাঁহার শরণ্য ছিলনা। * * চরিত্র-সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। * * বঙ্কিমচন্দ্রও কবিগুণধর শিল্পী। * * শিল্পী মাত্রেরই প্রধান গুণ—সৃজন ও দর্শন শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পূর্ণ ভাবে রহিয়াছে ; বঙ্কিম কাব্য লিখিতে যান নাই—গল্প লিখিতে গিয়াছেন ; এবং এই গল্পেই তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। * * বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব সামর্থ্য অসাধারণ ; * বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি আমাদের সাহিত্যে অনন্য সাধারণ। সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সত্যের দর্শন, অনুরূপ চরিত্র সংঘটনার বিষয়ে বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে একক।"

বাবু রজনী কান্ত সেন তাঁহার বঙ্কিম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "বঙ্কিম চন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনা প্রণালীর যে ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই ত্রুটীর সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। * * তাঁহার (টেকচাঁদের) রচনার ভাব গ্রহণে যেরূপ কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ সরল শব্দযোজনার গুণে উহা পাঠকেরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না। * * বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর ও অক্ষয়কুমার রচনাগত গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। টেকচাঁদ

ঠাকুর ভাষার এই স্তর হইতে অতি নিম্ন স্তরে গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের এই উভয় স্তরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ব্যোমযান বিহারী আকাশ পথে উত্থিত হইলেও, বায়ুমণ্ডলের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। বায়ুপ্রবাহে যে স্তরে থাকিলে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অব্যাহত থাকে, জীবনী-শক্তির অপচয় না ঘটে, তিনি ততদুর উঠিয়াই, আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উত্থিত হইলেও জীবনী-শক্তি বিসর্জ্জন দেয় নাই।"

বঙ্কিমের রচনাকালকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, পাঠকের মনোরঞ্জন ও পাঠক সংগ্রহ,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতির দ্বারা। এই সকল গ্রন্থদ্বারা পাঠক সংগ্রহ করতঃ তিনি ক্রমশঃ তাঁহার উদ্দেশ্যের সীমা বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করিলেন। দ্বিতীয়ে, তিনি উপন্যাসচ্ছলে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষদান ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, রাজসিংহ, রজনী প্রভৃতি রচনা করেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরে তৃতীয়ে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করতঃ পাঠক পাঠিকাগণকে সমগ্রজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এই শ্রেণীর রচনা। উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, লোক রহস্য, কমলা কান্তের দপ্তর প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল। প্রাচীন বয়সে বঙ্কিম ধর্ম্ম-চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস কেবল ধর্ম্মমূলক ছিল না। অসামান্য যুক্তি কৌশলে তিনি বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন প্রথমে পাঠকবর্গের নিকট, সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীও প্রথমে পাঠকবর্গের নিকট সম্যগরূপে আদৃত হয় নাই। তখন কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে পাঠকের কদর্য্য রুচির খাদ্য সরবরাহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিতেন পাঠকের রুচি উন্নত করিতে; তিনি চাহিতেন 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য।' যুগ সাহিত্যের স্রোতে বা তৎকালে প্রচলিত পাঠকবর্গের রুচির স্রোতে তিনি তাঁহার রচনাবলীর গা ঢালিয়া দিতে সম্মত ছিলেন না। রুচি মার্জ্জিত করা, সমাজ সমুন্নত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাষার পরিপুষ্টি-সংসাধন ও তৎসঙ্গে পাঠক মণ্ডলীকে সৎপরামর্শদান ও তাহাদের সমক্ষে সদ্দৃষ্টান্ত সমুপস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ব্রত।

বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। * * সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

* * আমাদের মধ্যে যাহারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একতারে

বাঁধা ছিল, কেবল সহজসুরে ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে একএকটী করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

* * বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী প্রথমে পাঠক-বর্গের নিকট সমধিক আদর লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্কিমকে চিনিতে বা বঙ্কিমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পাঠক বর্গের অধিকদিন বিলম্ব হয় নাই। পাঠকবর্গের মনোরূপ ক্ষেত্র তখন বেশ উর্ব্বরই ছিল তাহার উপর বঙ্কিমের রচনারূপ বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল বটে; কিন্তু অঙ্কুরিত হওয়ার পর হইতেই সত্বর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শাখা বিস্তার পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"বর্ত্তমান কালের বঙ্গসাহিত্যকে একটী শস্যক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ইহা সংস্কৃত-বাঙ্গালারূপ লতাগুল্মাদি দ্বারা পরিপূর্ণ প্রান্তরের ন্যায় ছিল। রামমোহন

সেই কণ্টকপরিপূর্ণ প্রান্তর হইতে লতাগুল্মাদি উৎপাটন করিয়া, পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলেন অর্থাৎ তাঁহার দ্বারাই বঙ্গগদ্য সাহিত্যের ভিত্তি সৃষ্টি হইল। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই অনুর্ব্বর ভূমিকে পরিশ্রমের সহিত কর্ষণ করিলেন, বিদেশজাত ফলফুলের বীজাদি সংগ্রহ করিয়া সুন্দর রূপে বপন করিলেন, ভূমিতে ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যরূপ সারদিতে ভুলিলেন না এবং সেই বঙ্গসাহিত্য বীজগুলি যাহাতে 'ঈত্যা'দির দ্বারা না নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাঁহার পর অক্ষয়কুমার নীতিরূপ জল হইয়া, সেই সুকুমার বঙ্গসাহিত্য চারাবৃক্ষগুলির মূলদেশে সেচন করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য বৃক্ষগুলি বড় হইয়া ফলভারাবনত হইয়া পড়িল; সেই বৃক্ষগুলিতে দুইপ্রকার সুমিষ্ট ফল ফলিল। একপ্রকার ফল লইয়া মাইকেল হেমচন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধারণ লোকদিগকে কবিত্বের আস্বাদ দিলেন, অপর দিকে প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গণ অন্যপ্রকার ফল লইয়া লোকদিগকে উপন্যাসের আস্বাদ দিলেন। লোকে এই দুই প্রকার ফল খাইয়া, পরিতৃপ্ত হইয়া বৃক্ষের বপনকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং যাহাতে সাহিত্যবৃক্ষে তদ্রূপ আরও উপন্যাস ও কবিতাফল জন্মায় সেইরূপ পরিশ্রম করিতে লাগিল।

* * বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে বহু পরিশ্রমের সহিত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে পর, আধুনিক বঙ্গলেখকগণ তাহার উন্নতি-চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মাইকেল, বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্য সেবকগণ বঙ্গসাহিত্যের শোভা বিস্তার করাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উদ্ধার

সাধন না করিলে, তাহাকে নূতন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে না ধরিলে, বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইত কি না সন্দেহ; এ সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনের পর হইতেই এত কৃতবিদ্য বঙ্গলেখক দৃষ্ট হইতেছে; উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত উপাধিধারী বঙ্গবাসীগণ এবং সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতেছেন. অর্থাৎ প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ইংরাজি সাহিত্যপুস্তক সমূহ হইতে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতেছেন; এবং শেষোক্ত দল স্বদেশীয় মনীষাসম্পন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদি হইতে লুপ্তপ্রায় রত্নাদি উদ্ধার করিয়া বঙ্গসাহিত্যাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন। আর একটি কথা এই, যে বর্ত্তমান কালে যে কোন ব্যক্তি জীবনচরিত, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি বা নীতি গ্রন্থাদি বা অন্য কোন প্রকার ভাবপরিপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করুন না কেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুসরণ করিতে হইবেই। * * *

সেইজন্য ইহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন কালে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে এত উন্নতি তাহার আদি কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। আজকাল যে এমন সুশ্রাব্য ও সুমিষ্ট বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, বিদ্যাসার মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল। তাঁহার এক এক খানি অনুবাদগ্রন্থ এক একখানি মূল গ্রন্থাপেক্ষাও মূল্যবান। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা হইতে কি প্রকার সরল বঙ্গানুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার পথ প্রদর্শক; তিনি মাসিক পত্রিকাদির লিখন প্রণালীর পথ প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যচর্চ্চা প্রবল করাইয়া গিয়াছেন ও ব্যাকরণাদি প্রণয়ন করিয়া

সংস্কৃত শিক্ষার উপায় দেখাইয়া দিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিপথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বঙ্গগদ্য সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, যতকাল বাঙ্গালা ভাষা আদৃত হইবে, যতকাল লোকে বঙ্গ গদ্যের প্রশংসা করিবে, ততকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সমগ্র সাহিত্যজগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

আজ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশ কাঁদাইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে অনাথা করিয়া, জগৎকে শোকসাগরে ডুবাইয়া অনন্তকাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বর্ণপরিচয় হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থ গুলিতে তাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে; যতকাল লোকে বাঙ্গালা কথা কহিবে বা বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিবে, ততকাল লোকে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সম্প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে ভবিষ্যৎকালে বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃত বা ইংরাজি সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া, তাহাদিগের ন্যায়, জগৎপ্রসিদ্ধ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন সাহিত্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র আত্মাকে অভিবাদন করিয়া বলিবে 'আমি আপনার নিকট চিরজীবন ঋণী, আপনি আমার বিপদে রক্ষাকর্ত্তা ও পিতৃসদৃশ পালন কর্ত্তা।'

ঈশ্বরচন্দ্র এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, বঙ্গ-সাহিত্য জগতে চিরকাল অবিনশ্বর রহিবেন"

* ভারতী—মাঘ, ১৩০১

জীবদ্দশায় নিজরচনার সম্যগ্ আদর দেখিতে পাওয়া, অথবা উচ্চ অঙ্গের রচনাদ্বারা-বিপুল সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া, অতি অল্প লেখকেরই ভাগ্যে ঘটে। বিলাতে স্যর ওয়াল্টর স্কট, লর্ড বাইরন প্রভৃতি এবং আমাদিগের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশ সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কেবল সাহিত্য রচনা দ্বারায় বিপুল যশঃ ও প্রভূত সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব বর্ণনালালিত্য থাকিলেও সৃষ্টি কৌশল তদনুরূপ নহে; তাঁহার তিনখানি নাটকের গল্পাংশ প্রায় এক; কিন্তু ইংলণ্ডের মহাকবি শেক্ষপীয়রের যেমন বর্ণনা-বৈচিত্র্য তেমনি সৃষ্টি কৌশল। আমাদিগের বঙ্কিমচন্দ্রেরও সৃষ্টি কৌশল যথেষ্ট। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন—কিন্তু কোনটীরই গল্পাংশ অন্য কোনটীর সহিত মিলে না। বঙ্কিমের সৃষ্টিকৌশল যথার্থই প্রশংসনীয়। এক দুর্গেশনন্দিনীতেই আমরা তিনটী তিনপ্রকার অপূর্ব্ব নারী চিত্র দেখিতে পাই। আয়েষা কবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি—যেন মানসী প্রতিমা। "স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।" গল্পাংশে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী স্কটের আইভ্যানহোর সঙ্গে স্থূলভাবে মিলিলেও ইহাতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব, বঙ্কিমের মৌলিকতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা hat, coat, gown বা helmet, gauntletএর কোন চিহ্নও দেখিতে পাই না; জগৎ সিংহ ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ duel tournament-এর অনুকরণ মনে হইলেও—তাহা মনে করা অন্যায়। সংস্কৃত নাটকাদিতেও দ্বৈরথ সমরের বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, ইহাতে ইংরেজির গন্ধ মাত্র দেখিতে পাই না; আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কথায় বার্ত্তায়—সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে

বাঙ্গালী ধরণের। আবার অনেকে বলেন বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে Ivanhoe মোটেই পড়েন নাই। তাঁহাদের মত সমর্থন কল্পে তাঁহারা অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস লইয়াও এই বিভ্রাট দেখিতে পাই।

অধুনা বঙ্কিমের অনুশীলন এত অধিক হইয়াছে যে তৎসমুদয় একত্র করিলে একখানি স্বতন্ত্র বিপুলকায় গ্রন্থ হইতে পারে। অধ্যাপক স্বর্গীয় ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন) তাঁহার নিজের অননুকরণীয় ভাষায় অতি সুন্দররূপে নিরপেক্ষভাবে ধারাবাহিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃতানুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুশীলন যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন আরও অনেকেই করিয়াছেন। রায় সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিতকে তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা হারাণবাবুর 'বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—"বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। * * বঙ্কিমের প্রাণময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা পড়িতে পড়িতে এক একবার আমার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি কবিতা পড়িতেছি। * * বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হিসাবে ভাষার জন্মদাতা ও গুরু বটেন,—ভাষাও তাঁহার খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাঁহার ভাষাতেও যেন কেমন বিনাইয়া বিনাইয়া, শ্রোতৃবৃন্দের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। * *

এক্ষণে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা শ্রেণীর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস; জীবন বৃত্তান্ত, প্রত্নতত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েইকোন না কোন গ্রন্থ দেখা যাইতেছে,—ইহার মূল বঙ্কিম। বঙ্কিমই প্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচলিত করিয়া,—রাজার

দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজ যে, এখন বাংলা সাহিত্যের একটু খোঁজ খবর রাখেন,—ইহার মূলেও বঙ্কিম। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি বাঙ্গালা সাহিত্য একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ইহার এরূপ পুষ্টি ও প্রচার কখনই সম্ভবপর হইত না। * * বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে না নামিলে,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা না করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্য আজ কখনই রাজা প্রজা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না; * * * সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়,—বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞ,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ * * *

বঙ্কিম প্রতিভাবান কবি; তাই তিনি ভাব ও চিন্তার আদর্শে ভাষা গঠিত করিয়াছিলেন,—ভাষার আদর্শে ভাব বা চিন্তা ব্যক্ত করেন নাই। কেবল কাণে মিষ্ট লাগিবার জন্যই যে, তিনি স্থান বিশেষে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেন তাহা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে ভাষা সহজে ও শীঘ্র লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে—যেটি একটী জীবন্ত মূর্ত্তির মত পাঠকের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, সেই ভাষাই অধিক ফলদায়িকা। এই জন্য সাধু শুধু সংস্কৃত মূলক ভাষা অপেক্ষা চলিত অথচ কবিত্বময়ী বাঙ্গালা ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং কাব্যে তাহার প্রাধান্যও দিতেন।

* * * কেবলমাত্র উপন্যাসের দিক হইতে দেখিলে একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি,—কি ভাব, কি ভাষা, কি বর্ণনা, কি চরিত্র-চিত্র, কি রচনানৈপুণ্য, কি লিপিকুশলতা, কি উদ্ভাবনী শক্তি; কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, কি ঘটনাসামঞ্জস্য, কি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত,—সকল বিষয়েই আমাদের বঙ্কিম, উপন্যাস জগতে **রাজ রাজেশ্বর**।”

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কারে ফেলে কারে রাখি'—নির্ণয় করা কঠিন। অনেকের মতে বিষবৃক্ষ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আবার হারাণচন্দ্র রক্ষিত বলিয়াছেন "বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতেন। অপিচ, লিপিকুশলতা, চরিত্রচিত্র, ভাষার পারিপাট্য, সূক্ষ্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার একথা ঠিক বটে।" হারাণবাবুর নিজের মতে "কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং এই কপালকুণ্ডলাই কাব্যাংশে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ, ইহা বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নহে। কাব্যের যাহা চরম লক্ষ্য,—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি,—অত্যুন্নত, উদার, অনন্ত, অপূর্ব্ব সুখ-কল্পনা-প্রসূতা স্বপ্নময়ী সৃষ্টি,—তাহা এই প্রকৃতিপালিতা, সরলা স্বভাব-সুন্দরীর চরিত্রচিত্রে প্রস্ফুটিত। * * মিরন্দা দ্বীপবাসিনী হইলেও পিতাকে জানিত, পিতার স্নেহ পাইত, সংসারী জীবের সুখ দুঃখের মাত্রা বুঝিত।—শকুন্তলা নির্জ্জন তপোবনে পরিবর্দ্ধিতা হইলেও ঋষিকুমারী-গণের নিকট প্রায় সাংসারিক সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছিল।—কিন্তু এ, কি এ! এ যে বজ্রকঠোর-দৃঢ়তার পার্শ্বে প্রস্ফুটিত কমলিনী! তান্ত্রিকের তান্ত্রিক মূর্ত্তিমান কাপালিকের পার্শ্বে স্নেহ-মমতা-সরলতাময়ী ক্ষুদ্র বালিকা! 'কপাল কুণ্ডলা' বঙ্কিমের চরম সৃষ্টি,—উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পার্শ্বে বঙ্কিমের অন্যান্য সৃষ্টি ধরিলে ম্লান ও মলিন হইয়া যায়। শুধু কাব্যাংশে কেন,—নাট্যাংশেও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি! * * * এই কপালকুণ্ডলাতেই বঙ্কিম অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"

স্বদেশভক্তি ও জাতীয়তা বঙ্কিমচরিত্রে অনুশীলনের আর একটা জিনিষ। তিনি সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা লক্ষ্য করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন "জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয়-কীর্ত্তি। তিনি মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন; বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী ছিল। একাধারে তিনি কবি, উপন্যাস-কার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় বাঙ্গালা ভাষার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞান বিস্তার না হইলে, কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না এবং কোন জাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার করিয়া স্বজাতিকে অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। * * * যিনি স্বদেশীয়দিগকে এইরূপে জ্ঞান সম্পন্ন করিয়া পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত, মহাজাতির মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিয়া অসামান্য কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার এত গৌরব, এই জন্য তাঁহার এত সম্মান।"

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের লেখকগণের রচনার সংক্ষিপ্তানুশীলন করিব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৩) ইনি একজন বঙ্কিমের সমসাময়িক লেখক; ইনি চিকিৎসা বিষয়ক অনেক পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। শরীর পালন, ধাত্রী শিক্ষা, সরল জ্বর চিকিৎসা

(তিন খণ্ড), বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি শিক্ষা, রোগ বিচার, চিকিৎসা উদ্ভিদবিচার প্রভৃতি ইহার রচনা। ইহার চিকিৎসাকল্পদ্রুম সে সময়ের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।

কালীময় ঘটক (১৮৪০-১৯০০) : কালীময় ঘটকের গদ্য রচনার মধ্যে চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ তৎকালের বালকদিগের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। ইঁহার অন্য গদ্য গ্রন্থের মধ্যে ছিন্ন মস্তা, শর্ব্বাণী, কৃষি শিক্ষা, কৃষি প্রবেশ, সুরেন্দ্র জীবনী উল্লেখ যোগ্য।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৪০) : সঙ্গীত শাস্ত্রে সৌরীন্দ্রমোহন দিগ্বিজয়ী বীর; সঙ্গীতের জন্য জগতে তাঁহার অতুল সম্মান। পৃথিবীর এমন দেশ, এমন রাজ্য নাই, যেখান হইতে তিনি উপাধি বা পারিতোষিক না পাইয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন : সঙ্গীত সার, জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, মৃদঙ্গ মঞ্জরী, একতান, হারমোনিয়া সূত্র, হিন্দু সঙ্গীত যন্ত্রবোধ প্রভৃতি। "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত," "মুক্তাবলী," "মণিমালা," "ধাতুমালা" প্রভৃতিও তাঁহার পূর্ব্বেকার রচনা।

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২)—জগদ্বন্ধু বাবু আবাল্য সাহিত্য-সেবক। ইঁহার হানিফ গাজী ইংরেজি জন গিলপিনের অনুকরণে রচিত। ইঁহার ব্যঙ্গকাব্য 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' সে সময়ে সকলেরই নিকট বিশেষ রূপে সমাদৃত হয়। "বান্ধবে" জগদ্বন্ধু বাবুর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে, সীতারাম রায়, পৃথ্বীরায়, আবুল ফজল, বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক, হীরক, মৌক্তিক, বাড়বানল, বায়ুমহাসাগর, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এবং হিন্দুভূগোল নামক প্রত্নতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। "ঐতিহাসিক গল্প" ইঁহার সুন্দর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ।

শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪২-১৯১১)—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গ ভক্ত পরম বৈষ্ণব। ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমিয় নিমাই চরিত—যাহা আজিও বাঙ্গালা ভাষার একখানি অমূল্য রত্ন। এতদ্ভিন্ন অমিয় ভাণ্ডার, কালাচাঁদ গীতা, নয়সো রূপেয়া, নরোত্তম চরিত প্রভৃতি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ইংরেজি ভাষায় লর্ড গৌরাঙ্গ নামক একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। নয়সো রূপেয়াখানি সামাজিক নাটক।

কালীবর বেদান্ত বাগীশ (১৮৪২-১৯১১)—কালীবর বেদান্ত বাগীশ একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত; ইনি পাতঞ্জল দর্শন, গুরুশাস্ত্র, চরিত্রানুমান বিদ্যা, পূর্ব্বমীমাংসার্থ সংগ্রহ, বেদান্ত সংজ্ঞাবাণী, কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, বেদান্ত সার, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের সরল অনুবাদ প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত ইহার পরলোক রহস্যে ইনি বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ ও ঘটনাদ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৯১১)—বীরেশ্বর পাঁড়ে বঙ্গভাষার একজন চিন্তাশীল লেখক, ইঁহার ভাষাও বেশ ওজস্বিনী। ইঁহার রচনার মধ্যে মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, আর্য্যপাঠ, আর্য্যচরিত, আর্য্যশিক্ষা, অদ্ভুত স্বপ্ন, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; তন্মধ্যে কতকগুলি শিশুপাঠ্য ও অপরগুলি উচ্চপাঠ্য। উচ্চপাঠ্যগুলিতে দর্শন, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এত সারগর্ভ ও জটিল বিষয় এরূপ সুচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে যাহা পাঠ করিলে প্রবীণেরাও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এরূপ উচ্চঅঙ্গের বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহার সময়ে ছিল না বলিলেই হয়।

ইহার রচনায় যেমন সুমার্জ্জিত ভাষা তেমনি অতি উচ্চ ভাবসমষ্টি পরিলক্ষিত হয়। মানবতত্ত্ব একখানি রীতিমত উচ্চঅঙ্গের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ; ইহার বর্ণিতব্য বিষয় অতি জটিল, অতি দুরূহ হইলেও লেখক নিজ অসামান্য শক্তি ও যোগ্যতার বলে নিজ প্রস্তাব্য বিষয় কেমন প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানবতত্ত্ব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে; স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ। শক্তি প্রকাশের পূর্ব্বভাবের নাম ইচ্ছা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইচ্ছাপূরণ বা সুখই মানবের উদ্দেশ্য। সুখসাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয়। কিন্তু যখন বহু যন্ত্রসংযোগে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন মানবে নানা প্রকার শক্তি নিহিত আছে বলিতে হইবে। যতপ্রকার শক্তি মানবে আছে, তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করা হইল। কিন্তু তদন্তর্গত শক্তি সকলের কতকগুলি এরূপ পরস্পরবিরোধী যে একের তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে অপরের বিরোধাচরণ করা হয়; সুতরাং এক বিষয়ে সুখী ও কর্ত্তব্যপর হইতে হইলে অপর বিষয়ে অসুখী ও কর্ত্তব্যবিরত হইতে হয়, এবং মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়। সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে।"

ইনিও ভূদেববাবুর মত বাল্যবিবাহ প্রথার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই

মানবতত্ত্বেই ইনি লিখিয়াছেন : "যখন বিবাহ বন্ধন যাবজ্জীবনের জন্য দৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক তখন বাল্যকালে বিবাহ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহা হইলে দাম্পত্যপ্রণয় আজীবন দৃঢ় থাকিবার অধিক সম্ভব। অধিক বয়সে বিবাহে যে, সেরূপ হইতে পারে না, ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহার প্রমাণ ; অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই তথায় নিত্য সহস্র সহস্র বিবাহ ভঙ্গের কারণ হইতেছে। কিন্তু ভারতে বিবাহ ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তথায় পতির মৃত্যুতে সতী আত্মদেহ বিসর্জ্জন করে। * * * বাল্য বিবাহে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই যে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাধীন হয় না, সুতরাং বিবাহান্তে উভয়ই একরূপ সংস্কার বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে। * * বাল্যবিবাহের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, ঐ সময়ে মিলন কালে দম্পতীর মনে কোনও অপবিত্র ভাবের উদয় হয় না। সে সময়ে তাহারা যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইতেছে বোধ করে।"

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, (১৮৪৩-১৯১১)—ইনি বঙ্কিমের যুগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, সদ্বক্তা ও সুলেখক। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে দীনেশ বাবু তাঁহার 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্যে' লিখিয়াছেন—"ভাষা ওজস্বিনী, বাক্যগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,—সমাসবদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন অংশ হীনবল নহে,—এ যেন অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু হইতে শরনিক্ষেপ করিতেছেন—সে গাণ্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য্য নহে,—মেঘনাদবধ কাব্যের মত উন্মাদনাময়ী ভাষা। ২০ মিনিটকাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল * *

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনিলাম, বঙ্গভাষার যে কি ভয়ানক শক্তি—সেদিন বুঝিলাম। * * যত মনস্বী বাগ্মীর বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পাহাড় পর্ব্বত নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধ-স্রোতা ঐরাবত-বিজয়ী দুর্জ্জয় গঙ্গার মত,—বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জ্জনের মত, শিবের প্রণবধ্বনির মত,—বিজয় দুন্দুভির মত—বঙ্গভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীতে যে বঙ্গভাষাকে এলাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় সেই ভাষাকে জয়শ্রীমণ্ডিতা সাম্রাজ্ঞীর মত দেখিয়াছি। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে—সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা মনে হইয়াছিল।" ঐ পুস্তকেরই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা দেশে তাঁহার (কালীপ্রসন্নের) মত কথাবার্ত্তার প্রতিভা আমি আর কাহারও দেখি নাই, তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ছিলেন, কথা বলিবার সময় মনস্বিতায় তাঁহার চোখদুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত; দুইটি সুন্দর ঠোঁট উৎসাহিতভাবে কথা বলিবার সময় যেন একটু একটু কাঁপিত, কোন তেজস্বিনী নদীস্রোত পুষ্পিত লতার উপর বহিয়া গেলে যেরূপ কাঁপে। যাহা বলিতেন তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ পদে ঠিক পণ্ডিতের লিখিত ভাষার মত শুনাইত, প্রভেদ এই যে তাহা প্রাণের আবেগ বহন করিত। আভিধানিক শব্দগুলি তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকের মত ছিল। তাঁহার ধনুতে জ্যা দিবার শক্তি অন্য কাহারও ছিল না; গাণ্ডীব যেরূপ পার্থের, বীণা যেরূপ নারদের তাঁহার ভাষা সেইরূপ তাঁহারই ছিল। তাহা অনুকরণকারীর নৈরাশ্য ও শ্রোতার চির-বিস্ময়।"

"বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাঁহার সাহিত্যসুনাম প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।"

ইঁহার মত প্রগাঢ় চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। ইঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথচিন্তা গভীর গবেষণার জলন্ত দৃষ্টান্ত; অপর গ্রন্থের মধ্যে পার্কারের জীবনচরিত, আমেরিকার সভ্যতা (পাণ্ডুলিপিতেই অপহৃত), সঙ্গীত মঞ্জুরী, সমাজ-শোধিনী, রিবাহ-রহস্য, ভক্তির জয়, ছায়া দর্শন, মা না মহাশক্তি, ভ্রান্তি বিনোদপ্রমোদ-লহরী, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালী-প্রসন্নের মত একাধারে পণ্ডিত, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও সুলেখক ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে আর দেখা যায় না। ভক্তির জয়ে ভক্ত-প্রবর যবন হরিদাসের জীবন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্ক মোহন সেন কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যিনি বঙ্গবাণীর আপন চিত্তসঞ্জাত উজ্জ্বল শুভ্র সন্দর্ভ-মুক্তাহার পরাইয়া-ছিলেন, তাঁহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে বহুমানিনী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মুক্তা হীরকের ন্যায় দীর্ঘজীবী বা বহুমূল্য হইবে কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করা আমাদের প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সেই মুক্তা অকুণ্ঠিত উজ্জ্বলতায় মাতৃকণ্ঠে শোভা পাইতেছে; রসজ্ঞ পাঠক বা বঙ্গীয় লেখক মাত্রেই দীপ্তি এবং ওজস্বিতা লাভার্থে তাহার সম্মুখীন হইতেছেন এবং উহা হইতে নানা মতে উপকৃত হইতেছেন। * * *

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন, ইহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের মহাপ্রবাহ আনিয়াছেন; প্রত্যেকে স্বকীয় হৃদয়ের বিশিষ্ট রসেও এ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। * *

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্য গদ্যবিভাগে নবজীবনের শৈশবেই দুইজন কৃতী পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা বাঙ্গালীকে অসীমের

অন্থে দীক্ষিত করিবার জন্য চিরজীবন অস্খলিত সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সে দুইজন যে কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বঙ্গবাসী বিনা বিচারেই স্বীকার করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র কবিগুণসম্পন্ন শিল্পী; তিনি আকৃতিপ্রকৃতির ভিতর দিয়া মহানকে এবং অব্যক্তকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কপাল-কুণ্ডলা, ভ্রমর বা প্রতাপের মধ্যে মনুষ্যত্বপথে সেই অসীমের অনুভব-ভূমিতে উঠিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন কবিগুণসম্পন্ন দার্শনিক; তিনি তারা ও ফুলে, সাহিত্যে ও জাতীয় বিকাশে, প্রজা ও রাজশক্তিতে ভক্তিতে এবং রসপরিহাসে, প্রভাতে সন্ধ্যায় নিশীথে, সজনে ও বিজনে, ইহকালে ও পরকালে, চিন্তা এবং ভাবুকতার পথে সেই অসীম অব্যক্ত এবং অমৃতকেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন! বঙ্গ-সাহিত্যে, বাঙ্গলা গদ্যে সমুন্নত অথচ বীর্য্য পৌরুষ যুক্ত ভাবুকতার উচ্ছ্বাস-ধারণায় কালীপ্রসন্নই অগ্রণী!

সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম এবং পূজ্যতম পদার্থ লেখকের হৃদয়। যে লেখক উদার হৃদয় পাইয়াছেন ও তাহাকে অনাবিল ভাবে প্রকাশ করিবার ভাষা পাইয়াছেন, সাহিত্যে তাঁহারই জয়। * * কালীপ্রসন্নের বুদ্ধিও সর্ব্বথা হৃদয়ানুসারিণী ছিল! প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা বা ভক্তির জয় প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বত্র সেই বিপুল, ওজস্বী এবং তড়িৎ-বিভাসী হৃদয়েরই পরিচয় পাই! ওই হৃদয় একদিকে যেমন শিশুর মত সরল, অন্যদিকে তেমনই গহন প্রবৃত্তি এবং রাজশ্রীতেই সমুন্নত ছিল। তাঁহার ভাষা একদিকে যেমন সরল ও ঋজুগতি, অন্যদিকে তেমনই জ্যোতির্বিলসিত বিপুল আবর্ত্তে কল্লোলিনীর মত ছুটিয়া চলিত! তাঁহার হৃদয় কিংবা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, সংন্যাসীর

হৃদয় অথবা শুষ্ক বৈরাগীর আধ্যাত্মিকতা নহে—অপরূপ জ্ঞান-কর্ম্মে, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে উল্লাসী, অপ্রমত্ত অথচ সুখী, ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা! তিনি জ্ঞানী হইয়াও বৈরাগ্য বিলাসী কিম্বা দুঃখবাদী নহেন। আবার রামই তাঁহার প্রিয় আদর্শ; যুধিষ্ঠির নহেন; সুতরাং তিনি রামায়ণে প্রেমের পরাকাষ্ঠা এবং মহাভারতেও প্রেমের অভাব দেখিয়াছেন! এই কারণেই তাঁহার হৃদয় বিশ্বময় অমৃত-তত্ত্বের অন্বেষণে এবং প্রত্যক্ষীকরণে ধাবিত হইয়াছিল; ঐহিক অমরতার স্বপ্নেও বিস্ফারিত হইয়াছিল! বঙ্গসাহিত্যে এবং এতদ্দেশের মৃত্তিকায় এই প্রকৃতির হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতা নূতন! * উহা হয়ত সর্ব্বদিকে সর্ব্বরূপে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই; ভবিষ্যতের সৌভাগ্যবান সাধকের অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে ইহা নূতন। ইংরাজী সাহিত্যে এ জাতীয় ভাষাপদ্ধতির পরিচয় পাই মিলটনে ও বার্কে; এজাতীয় ভাবনা পদ্ধতির পরিচয়—পাই কার্লাইলে এবং এমার্সনে। উহা পাশ্চাত্য আর্য্যপণ্ডিতের প্রকৃতি। * *

কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ছিলেন। বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া তাঁহার আসন সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে নির্ব্বিশেষে শুনিয়াছি, অন্বর্থ এবং উল্লসিত ত্বরিত বাক্যঘটায় হৃদয়কে তদ্গত আনন্দে অধিকার করিতে বঙ্গভাষার যে এত শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা কালীপ্রসন্নের বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কবি হেমচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি-স্মৃতি-সভায় কালীপ্রসন্ন সভাপতিরূপে কলিকাতায় আহূত হন। সে সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানীর সমস্ত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র একবাক্যে বঙ্গভাষার এই অপূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশক্তির

প্রশংসা করিয়াছিলেন ; ইহা কালীপ্রসন্নের সামান্য গৌরব বা প্রতি-পত্তির কথা নহে।

কালীপ্রসন্নের হৃদয় নিয়ত ভাবের উচ্চগ্রামে বিচরণ করিতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিত—তাঁহার কণ্ঠও তারস্বরে বিলসিত হইত। * * সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে তাঁহার নিরাবিল সহৃদয়তা, সাহিত্যসেবীর প্রতি তাঁহার সদয় সহানুভূতি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। * *

বঙ্গভাষা এখন নানা সাহিত্য ও প্রতিভার সংসর্গে বহুমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন ; কাব্যে সঙ্গীতে, ইতিহাসে উপন্যাসে, দর্শনে এবং সন্দর্ভে বঙ্গভাষা এখন নানা মূর্ত্তি ও প্রবৃত্তি আশ্রয় করিয়া আপনার সাফল্যকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। * * [কালীপ্রসন্ন] স্বয়ং এ সাহিত্যের শক্তি-সাধন করিয়া উহার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি বিষয়ে অতন্দ্রিতভাবে সেবা-তৎপর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। * *

কালীপ্রসন্ন প্রাকৃত বাক্য-প্রণালীর সবিশেষ বিরোধী ছিলেন ; * * অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে 'কালীপ্রসন্নের লেখা যে অতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, এইরূপ বিচার-বাক্য নির্লজ্জ গর্ব্বে প্রচারিত হইতেও শুনিতে হয় ! * *

কালীপ্রসন্ন অপেক্ষা জটিল বা গভীর ভাবগ্রাহী লেখক হয়ত বঙ্গ-সাহিত্যে জন্মিয়াছেন ; কিন্তু ভাবানুগত ভাষার স্থির শক্তি, উল্লসিত গতি এবং ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে কালীপ্রসন্ন অদ্বিতীয়। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব ও প্রভাত চিন্তার আনন্দ-স্তব্ধ 'নীরব কবি' হইতে 'ছায়াদর্শনের' অনন্ত ব্যাপিনী অমরত্ব তৃষা-পর্য্যন্ত, যে বৃহৎ, মহৎ ও উদার হৃদয়ের আত্মজীবনী প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্র ভাষা এবং ভাবনার রীতির একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গভীর ঐক্যসূত্র এবং

সামঞ্জস্য আছে। উহার ভিতর বিপুল সমুদ্রের অনন্তমুখিন্ প্রাণাবেগ এবং দীর্ঘনিশ্বাস ও প্রত্যক্ষরসিতকতার পরিচয় আছে; মনুষ্যের নিকটে নিজের বরিষ্ঠ এবং অনন্ত মুহূর্ত্তগুলির সুসম্বাদ বহন করিবার একনিষ্ঠ প্রয়াস আছে। ইহাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা; তিনি এই সাধনায় কর্ম্মোপযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমাদে হৃদয় অদ্য তাঁহার এই মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ!"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩—?)—

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার রচনার মধ্যে শরৎশশী, বিজ্ঞান দর্শক, হরিদাস সাধু ও চিত্ত চৈতন্যউদয় উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রসিদ্ধ নাটককার ও অভিনেতা; ইনি বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন; এইজন্য অনেকে ইঁহাকে "বাঙ্গালা'র গ্যারিক" আখ্যা দিয়া থাকেন। উপন্যাসে যেমন বঙ্কিম, নাটকে সেইরূপ গিরিশচন্দ্র। ইনি পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, ধর্ম্মমূলক প্রভৃতি অন্যূন ৭০ খানি বাঙ্গালা নাটক গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন। ইনিও এই বঙ্কিমের যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। ইঁহার ভাষা যেমন মধুর তেমনি ওজস্বিনী, যেমন প্রাঞ্জল তেমনি প্রাণস্পর্শী—নাটকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। এই জন্যই ইঁহাকে বাঙ্গালার নাট্যসম্রাট বলে। নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রসিদ্ধ সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার বাণী-মন্দির নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাখা ছিল না, তাই তিনি

ভাবের আকাশে উড়িতে চেষ্টাই করেন নাই; আস্ত সমতল মাটীর উপর দিয়া পায়চারি করিয়াই গিয়াছেন। * * কবিত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহার বিপুল নাট্যরাজী হইতে কতিপয় সঙ্গীত ব্যতীত তদনুরূপ দশটী পংক্তি পরিচিহ্নিত করাই দুষ্কর! অথচ গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা; সহানুভূতির শক্তিও বিপুল; পাণ্ডিত্য—অন্ততঃ এলিজাবেথ-যুগের ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের পুঁথিবিদ্যাও সামান্য নহে। সে যুগের বিলাতী নাট্যকারগণকে ইনি যেন ছেঁচিয়া—পুড়িয়া খাইয়া হজম করিয়া বসিয়াছেন; পদে পদে তাঁহাদের শিল্পকৌশল, ঘটনা ও অবস্থার সংস্থান এবং সংযোজনা তাঁহার লেখনীতে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি, আমাদের হৃদয় ডাকিয়া উঠে, কোনরূপ সাহিত্য রচনায় তিনি যেন লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার একটী নাটকও যেন 'কাব্য' নহে, গদ্যও নহে, সুন্দর পদ্যও নহে—তাঁহার নিজের কথায় 'গৈরিশী' ছন্দে রচিত হইলেও পদ্য নহে। মধুসূদন বা হেম নবীনের সমকক্ষ ভাবুকতা ত দূরের কথা, তুলনযোগ্য বাক্যশক্তি, বিবরণী কিংবা বর্ণণী শক্তির পরিচয়ও গিরিশচন্দ্রে পাওয়া যায় না। প্রকৃত বাণীপুত্রের কথার মধ্যেই যে একটা 'সাধনা'র গন্ধ থাকে, একটা 'সাধা গলা'র আমেজ এবং বৈশিষ্ট্য থাকে এই বিপুলকর্ম্মা লেখকের মধ্যে তাহারই অভাব! ভাষা এত সাধারণ এবং ভাবুকতা এত দুর্ব্বল যে, কথার বাঁধুনি এত শিথিল ও শব্দশক্তি এত বৈশিষ্ট্যহীন এবং কাহিল যে কোথাও উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী মনস্বিতা কিংবা তেজস্বিতা লাভ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের প্রথম বস্তু যে ভাষা, তাহার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। মনুষ্যজীবনের কোন গভীর সমস্যার ধারণা, জীবনের আলেখ্য রচনাতে উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী কোনরূপ সূক্ষ্মতা কি গভীরতার পরিচয় কিংবা

কোন প্রকার মনোমত্তা ও উচ্চ শ্রেণীর মনোজীবনের প্রমাণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে উদগ্র হইতে পারিতেছে না! সাধারণ তাঁহার শ্রোতা; সাধারণ বিষয়; বক্তাও কোনদিকে অসাধারণ নহেন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পূজনীয় পদবী—বঙ্গদেশের সাধারণ সামাজিকের শিক্ষাব্যাপারেও সুতরাং তাঁহার গৌরবময় স্থান। কিন্তু বিপুল বিস্তারিত সারস্বতশক্তির লীলাব্যাপারসত্ত্বেও উহাতে যে সমুচ্চ 'সাহিত্য'-আদর্শের সৌন্দর্য্যপ্রকাশ কিঞ্চিন্মাত্র না ঘটিতে পারে, উহা যে 'কাব্য' আদর্শের একেবারে পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতে পারে; তাহার দৃষ্টান্তস্থান গিরিশচন্দ্র। অথচ গিরিশচন্দ্র পল্লবগ্রাহী নহেন; পাতলা মতি বা অস্থিরচরিত্রের ব্যক্তি নিশ্চয়ই নহেন; সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্বৃত্ততা কিংবা দৌরাত্ম্যও তাঁহার নাই। তথাপি শতসংখ্যক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াও, বাণীমন্দিরের অন্তরঙ্গ সাধকরূপে তিনি আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন না! এ-ব্যাপারের হেতুযোগ কোথায়, এ অনর্থের মূল কোথায় সাহিত্যসেবক তদনুসন্ধানে কোন সময় ব্যয় করিলে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপব্যয় হইবে না।

গিরিশচন্দ্র যাহাই লেখেন তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে যেন উহার প্রকৃত যোগ নাই। নিজের বহির্বাটীর 'বৈঠকখানা'য় বসিয়া গিরিশচন্দ্র যেন কেবল বুদ্ধিসংযোগে অভিনয় করিয়া যাইতেছেন; অপর কোন একব্যক্তি উহা লিখিয়া চলিয়াছে! এই সাময়িকতা, সময়—সেবা ও তন্মুহূর্ত্তে লিপিবদ্ধ করার অপিচ dictate করার গন্ধ গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেক রচনাতেই সহৃদয়বেদ্য হইয়া আছে!"

বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা শশাঙ্কবাবুর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। তবে, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এক শ্রেণীর,

অন্ততঃ একজন বিশিষ্ট সমালোচকের, স্বাধীন মত হিসাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ প্রদর্শিত হইল। আমাদের মতে গিরিশচন্দ্রে দোষ থাকিলেও তাহা গুণের আধিক্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৪) কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। ইনি বাঙ্গালায় 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক একখানি দর্শনমূলক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াগিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১৪)—শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা, ফুল ও ফল, ভারতরত্নমালা, কঃ পন্থা, নারসিংহপুরাণ, পৃথিবীর সুখদুঃখ, হরিবংশ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, হিন্দুত্ব, সংযমশিক্ষা, সাবিত্রীতত্ত্ব, বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রকৃতি, পশুপতিসংবাদ, বেতালে বহুরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত নূতনপাঠ প্রভৃতি বালকগণের পাঠোপযোগী স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও কয়েকখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজিতে পণ্ডিত হইলেও ইঁহার রচনায় ইংরেজির প্রাধান্য নাই; প্রত্যুত ইঁহার রচনায় যথেষ্ট মৌলিক গবেষণা পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালায় ইনি একজন সুদক্ষ সমালোচক। শকুন্তলাতত্ত্ব ইঁহার সমালোচনাশক্তির নিদর্শন; এই পুস্তকে তিনি মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমালোচনা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার মতের সহিত অপরের মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। তিনি এই পুস্তকে কালিদাসকে শেক্সপীর অপেক্ষাও বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যে তাঁহার এই মত সমর্থন না করিলেও, এই পুস্তকখানি তাঁহার স্বাধীন নিরপেক্ষ অনুশীলনের ফল—বলা যাইতে পারে। পুস্তক

খানির ভাষাও সুললিত, প্রাঞ্জল এবং হৃদয়স্পর্শী; দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম: "শার্ঙ্গরব ঋষিকুমার। তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না, পার্থিববল, পার্থিব শক্তি, পার্থিবসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয়। তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা। তিনি রক্ত মাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ। তিনি শান্তি নন, তিনি প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন:— বিনিপাত:।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীম মহিমামণ্ডিত পুরুসভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বিনিপাতঃ।' মহর্ষি কণ্ব হিমাচলের ন্যায় দরদর ধারায় গলিতেও পারেন এবং বিসুবিয়সের ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেও পারেন! কল্পনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে!

যদিও মহর্ষি কণ্বের সম্পর্কে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত একই ব্যক্তি, কিন্তু কণ্ব হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে অতি চমৎকার প্রভেদ লক্ষিত হয়—দুইজনকে প্রকৃষ্টরূপে দুই ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। * * শার্ঙ্গরব কিছু বাহ্যদর্শী; শারদ্বত অন্তর্দর্শী। * * শার্ঙ্গরব ব্যহ্যজগতের কবি; শারদ্বত অন্তর্জগতের কবি। শার্ঙ্গরব বাহ্যস্ফুর্তি; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। * * *

প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী। এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই তিনটীতে একটি। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন; তিনটির একই কাজ; তিনটিরর এক চিন্তা, এক হৃদয়। তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না। * * শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই বয়স, কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম। * * প্রিয়ম্বদা রঙ্গ করিতে ভাল বাসেন; শকুন্তলা রঙ্গ বুঝেন, কিন্তু রঙ্গ করিতে পারেন না; অনসূয়া রঙ্গ করিতে শেখেন নাই। অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম। * * অনসূয়া সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী। তারপর যখন দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন তখন অনসূয়া তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জ্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল তখন প্রিয়ম্বদাই একটা ছল করিয়া অনসূয়াকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোট ফোট। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিত পদ্মের ন্যায় সে ফুলের সমস্ত গৌরব পাপড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদা গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহাতেই চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছেন। অনসূয়ার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্যময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে। কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারী-প্রকৃতির প্রতিমা অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী। * * *

* * * এত গভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে কয়খানা নাটকে আছে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা তিন কি চারিখানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই তিন চারি খানার মধ্যে একখানা। গেটের 'ফাউষ্ট' আর একখানা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েট'ও আর একখানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তল এবং 'ফাউষ্ট' অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। * * *

কালিদাস! তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে। দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' ”

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪৪-১৯১৯)—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' নাম দিয়া কয়েকখানি পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভক্তি চৈতন্যচন্দ্রিকা, ইহকাল পরকাল, কেশবচরিত, বিধান ভারত, পথের সম্বল, গীতরত্নাবলী, বিংশশতাব্দী, গরলে অমৃত, কলি সংহার, যৌবন সংহার, ব্রহ্মগীতা, নববৃন্দাবন, যুগলমিলন, ঈশা-চরিত, সাধু অঘোরনাথ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত—ইঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ইঁহার বাল্যসখা কয় ভাগ এককালে শিশুদিগের জ্ঞানগর্ভ পাঠ্যপুস্তক ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪৪-১৯০৯)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন খুব বৈচিত্র্যময় বটে; হিন্দুর সন্তান কেশবসেনের দলে মিশিয়া হঠাৎ উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে আবার কেশবসেনের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ লইয়া কেশব সেনের সহিত মত ভেদ হওয়ায় ইঁহারই উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ জীবনে ইনি পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও পুনরায় উপবীত ধারণ করেন। পুরীতে ইনি অনেক দিন যাপন করেন ও পুরীর উন্নতি বিধান কল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথম বয়সে বিশেষ যত্নের সহিত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সারাজীবন ধর্ম্ম লইয়া কাটাইয়াছিলেন; অনেক দিন পরিব্রাজক ভাবেও ছিলেন। ইঁহার রচিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ; তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্ম্মচর্চ্চার সারাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৯১)—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্ণলতা, তিনটী গল্প, অদৃষ্ট, হরিষে বিষাদ, ললিত সৌদামিনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। কোন ইংরেজি সমালোচক বলিয়াছেন কবি গ্রে যদি অন্য কিছু না লিখিয়া শুধু Elegy written in a Country Churchyard লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি ইংরেজি লেখকদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তারকনাথবাবুও শুধু স্বর্ণলতা লিখিয়া গেলে বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন। তাঁহার স্বর্ণলতা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হইয়া অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বালকগণের পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বর্ণলতার মত নিখুঁত গার্হস্থ্য চিত্রপূর্ণ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

ডাক্তার রামদাস সেন (১৮৪৫—১৮৮৭)—

ডাক্তার রামদাস সেন আর একজন ধনী সাহিত্যিক। ধনীর সন্তান হইয়াও, ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বা মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মত অত্যন্ত সাহিত্যামোদী লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই

ইনি সংবাদ পত্রে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইঁহার ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য ও রত্নরহস্য,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রচুর মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। "ইঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আদরপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন বৃত্তান্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ এবং তাম্রশাসনাদি হইতে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন।" *

প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরের Oriental Academy হইতে ইনি Doctor উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি "কলিকাতা লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের অনেক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত [ছিলেন]। ইনি ভট্ট মোক্ষমুলর, বুলার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট পত্র লিখিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মতামত [আনয়ন করিতেন]।" *

নানা স্থান নানা দেশ হইতে বহু ব্যয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইনি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। বড় দুঃখের বিষয় ইনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে নিপতিত হন। অধিক দিন বাঁচিলে ইঁহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের আরও অনেক উপকার হইতে পারিত।

রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, (১৮৪৫-?)— রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালাভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাকৃত ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিপুল অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

* দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬)—মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, লর্ড মেটকাফের জীবনী, অযোধ্যার বেগম, ঝান্সীর রাণী, টমকাকার কুটীর, এই কি রামের অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ইঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক সত্য বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে ইঁহার গ্রন্থগুলি সমধিক মূল্যবান। ইঁহার রচনা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী ভাষাও তেমনি ওজস্বিনী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭)—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক। ইঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ১২৮৬ সালে ঢাকা কলেজগৃহে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র অজরচন্দ্রও একজন বর্ত্তমান খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী। কমলাকান্তের দপ্তরে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটী অক্ষয়চন্দ্রেরই লেখনী-প্রসূত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শন, সাধারণ ও নবজীবন প্রভৃতি পত্রাদিতে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ইঁহার বহুপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশবাবু বলিয়াছেন—"যখন বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগে অন্ধ হইয়া দেশীয় পুঁথিগুলিকে তামাকপাতার মত অশ্রদ্ধেয় মনে করিত, তখন ইনি ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী হইয়াও তারতম্যে বাঙ্গালা গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।"

ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া অক্ষয়কুমার চিরজীবন সাহিত্য সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ইঁহার প্রণীত সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, গোচারণের মাঠ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, হাতে হাতে ফল, পিতাপুত্র,

মোতি কুমারী, সাহিত্য পাঠ, সাহিত্য-সাধনা, মহাপূজা, রূপক ও রহস্য প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটী ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই প্রবন্ধটী বঙ্গশ্রীতে বাহির হইতেছে। সমালোচক হিসাবেও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার স্থান অনেক উচ্চে। কবি মধুসূদনের সহিত কবি হেমচন্দ্রের তুলনা কল্পে ইনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম: "কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের এরূপ ভক্ত, এরূপ গোঁড়া, এরূপ শিষ্যানুকল্প হইয়াও 'মিতাক্ষর' গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই, তিনি জানেন। ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন এখন আমি বলিতে পারিব না। তবে একটা কথা প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, যদি 'মিতাক্ষর' কেবল নিগড়-বন্ধনমোচনের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সেটা কিছু মহদুদ্দেশ্য সাধন নহে। চূড়, বলয়, অনন্ত—এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চূড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তালও ত সুরের নিগড়। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? তা নয়। দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি-শশী। ছন্দত নিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য-জগতে। নিগড়-ছেদনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে কারণেই হউক হেমচন্দ্র মধুসূদনের মিতাক্ষর গ্রহণ করেন নাই। তবে মধুসূদনের কবিত্ব তিনি বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন কখন পারি না। * * বীরকাব্যে হেমচন্দ্র সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের

নিম্নস্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিম্নে; সমকালবর্ত্তী 'শিক্ষিত' মধুসূদনেরও নিম্নে। * * বৃত্রসংহারে ছন্দ-বৈচিত্র্য থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে; মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে। তবে যুদ্ধ-বর্ণনা,—ওটি আমি ভাল বুঝি না।"

এইস্থলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রের স্বরচিত জীবন চরিতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। ইহা হইতে যে কেবল তাঁহার রচনা পারিপাট্যের বা তাঁহার সুনিপুণ সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা নহে; অধিকন্তু ইহা হইতে সে সময়ের ও তৎপূর্ব্ব সময়ের অনেক মূল্যবান তথ্যও অবগত হইতে পারা যাইবে এবং তৎসঙ্গে অতি সংক্ষেপে অথচ অতি নিপুণ ভাবে বিবৃত সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের এক ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে। এই নিমিত্তই এ উদ্ধৃতাংশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া গেল;—

"প্রথম গদ্য লেখক, রাজীব লোচন রায়। তিনি আন্দাজি ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রাজ বংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গদ্য-গ্রন্থকার রাম রাম বসু। তিনি প্রতাপ আদিত্যের জীবন চরিত লেখেন। এইদুই গ্রন্থই বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়। * * * তৃতীয় গদ্য গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। * * * মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গগদ্য সাহিত্যের একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে তিনি স্বয়ং ভাষার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। * * *

তখনকার [গঙ্গাচরণ সরকারের সময়ের] সাহিত্য সেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনা-

টমিক্যাল ডিসেক্‌সন্‌। অস্থিমাংস চর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্য গ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুইছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরী বাহির করিয়া, তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড ২ করি, তাহার পর আবার বোতলে পূরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমিত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল এক্‌জামিনার, রসায়নিক পরীক্ষক,—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখনা কেন, ইহার মধ্যে কি আছে? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য সেবা এইরূপ, আর তখনকার সেই কাদম্বরী পাঠ যেন বিশ্বেশ্বরের আরতি সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌ গদ্‌ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এ সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্য পূজা। এখনকার মত ছুরি কাঁচি বরষী লইয়া সাহিত্য-ভেদ সাহিত্য-বেধ সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না। হায় আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি!

* * * *

সপ্তমবর্ষে আমি প্রভাকর [ঈশ্বর গুপ্তের] পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে [অর্থাৎ ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে] অন্নদা মঙ্গল, তিনখণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধ বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরব্যোপাখ্যান ও সেক্ষপীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান পাল-বর্জ্জিনিয়া

প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। * * বি, এল, গুপ্তের মত সুন্দর সাধুভাষায় বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন ; * * * লেখা অতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও তরল। * * * [১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে] ফোকাল ডিস্‌টানস্‌ পদার্থটা কি, কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য তখন কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শিখিয়া ছিলাম'। 'আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, পক্ষপাদিক মানে বুঝিয়া ছিলাম, যাহার পরিমাণ পাঁচ ফুট। ইত্যাদি ইত্যাদি। * * *

[দত্ত] অক্ষয় কুমারের কথা সকল—অতি গভীর, লেখা প্রগাঢ়, ভাব গম্ভীর, তবু সে ভাল লাগিত, অথচ কৃষ্ণ বন্দ্যোর রাজোপাখ্যান কেবল গল্প বইত নয়, তাহা ভাল লাগিত না। * * *

একদিকে অক্ষয় কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্যদিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চক্‌চকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,—এই গৌরব এই আদর দেখিয়া বালকহৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেল্‌না জিনিষ নয়। * * * সহজ বাঙ্গালা আমি এখনও ফেল্‌না জিনিষ মনে করিনা। * * *

আমরা দশজনে এখন কত রকম বাঙ্গালা লিখিতেছি। কেহ ঝাড় ঝঙ্কার দিতেছি ; কেহ ফুলে ফলে শোভিত করিতেছি ; কেহ পেঁচের পর পেঁচ লাগাইয়া ভাষার কায়দা বিন্যাসে গোলকধাঁধা করিতেছি। কিন্তু মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ, সরল, সহজ, মিঠা-কড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ভাষা লিখিতে পারি কি ?

দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূরচূড়া, টেরি কাটা কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বরগুপ্ত. মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব চাল চিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক। * * তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুরতাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখন নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয় কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরেরপ্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও যে বেশ জানি সে কথা বলিয়া বুড়ো বয়সে অধর্ম্ম সঞ্চয় নাই করিলাম। * * *

কৃষ্ণবন্দ্যোর বাঙ্গালায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গালা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (ষ্টাইল) না আছে রস, না আছে আবেগ। * * *

অক্ষয় কুমার,—বিদ্যাসাগর,—বাঙ্গালার দুটা বাঘা ভালুকো লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। স্বদেশ-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ববোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। * * তত্ত্ববোধিনীতে পৌত্তলিকতার বিরোধ প্রকাশিত হইত না। * *

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয় কুমার দত্ত উভয়েই সাধু বাঙ্গালার লেখক ; উঁহাদের দুইজন হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের গৌরব, সে বাঙ্গালা

সাধু বাঙ্গালা। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে লেখনী চালনা করেন, পন্থা প্রদর্শন করেন,—প্যারী চাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য পড়িতাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রচলিত বাঙ্গালা অবহেলার সামগ্রী নহে। তাহার পর সেই সময়েই যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্র' পড়িতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম, যে সহজ সরল, চলিত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালীর সদাচার অনাচারের কথা, হাসি তামাসার কথা, লিখিলেও সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানের কথা পড়িতাম; সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না। বিদ্যাসাগরের বেতাল পঁচিশে পূর্ব্বকালের কথা পড়িতাম। * * কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরে এই কালের, এই বাঙ্গালির, প্রাত্যহিক জীবনের কথা, ঘরকন্নার কথা, সমাজের কথা, সহজ কথায় দেখিতে পাইলাম। সেই শিশুজীবনে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের গাম্ভীর্য্যে, রচনাচ্ছটায়, ভাবের ঘটায় ভুলিয়াছিলাম। টেকচাঁদের বিনা আড়ম্বর সরলতায়ও সেইরূপ বিমুগ্ধ হইলাম। গদ্যের গঙ্গাযমুনা স্রোত, আর ঈশ্বরগুপ্তের পদ্যের সরস্বতী আমার বাল্যজীবনের প্রয়াগস্থলে সমানে বহিতে লাগিল। আমি সেই মহা সঙ্গমতীর্থে মহানন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে কৃতার্থতা লাভ করিলাম। * * *

আলালের ঘরের দুলালে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র আছে। ভাল মন্দ দুই আছে। মদ খাওয়া প্রবন্ধে মদের-দোষ নানাভাবে, গল্পের ডাল পালা দিয়া বুঝান হইয়াছে। রামারঞ্জিকায় হরিহর পদ্মাবতী দম্পতি মধ্যে আপনাদের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে কাদম্বরীকার তারাশঙ্কর

স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। * * রামারঞ্জিকাতে মিত্র মহাশয় সেই কথারই বিশদরূপে এবং বিস্তারিত ভাবে সমর্থন করেন। আমি উভয় গ্রন্থই সমাদরের সহিত পড়িয়া ছিলাম। * * বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটী যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। * * *

রামকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'

[এক ফেরি ওয়ালার নিকট] একদিন নাড়িতে নাড়িতে একখানি এড়াতে চটি বই পাইলাম, * নাম 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'; এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, 'আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ বর্ষ বয়স্কা এক ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়ন যুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবা-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভর ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে

পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, কোন দিন মছলী বন্দরে মাস্তুলের বন, কোন দিন সাফা ঊর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মন্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র—এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।'

অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' ভাষার বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না। * * বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনিনা, বা লিখিতে দেখিনা। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। * * আমি বালক কালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। * *

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করাইয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেঁচার নক্সা। আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নক্সা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। * * মনে করিলাম আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফোয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী * *

যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার (ভূদেব বাবুর) শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। বোধ করি, বিবিধার্থ সংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। * *

ইদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গালার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারি, কোন্‌টা পথ, কোন্‌টা অপথ, কোন্‌টা কুপথ, একটু একটু চিনিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথমদিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। * * বুঝিয়াছিলাম সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও রয়স্কা কুলীন কন্যার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। * * যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া, সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালীকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতার কলেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য

অথচ 'রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র 'কপালকুণ্ডলা' লিখিলেই, কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিলনা। * * বঙ্কিম বাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। * *

পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতে ছিলেন। * * তিনি [কালীপ্রসন্ন] বঙ্গের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন। ঢাকায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। * * * ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে ঢাকার কলেজ ভবনে পিতা বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানিও বড় বড় অক্ষরে ৭৪ পৃষ্ঠায় সাধারণী যন্ত্রে ছাপিয়াছিল। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পর্য্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিশদরূপে আছে। ইহার শেষভাগের দুই দশ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দিতেছি।

'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন চরিতের পর, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জনসোনিয়ান ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্যছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিক্ষণ থাকে না। এইজন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই। * * ইহার কিছুদিন পরে সাহিত্য সংসারে আর একজন আশ্চর্য্য লেখক প্রবেশ করিলেন। বাবু

বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নামিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতি মোহকর নহে, কেবল মধু পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তাড়িত্তেজ প্রভূত ভাবে বহিতেছে, ইহা ভাব-বৈভবেও অতি ঐশ্বর্য্যশালী। বঙ্কিমবাবু কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনা শক্তিও অতি বলবতী। অতএব তিনি যেমন একদিক হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিক হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুরি-ময়ী, তেমনি শক্তি সম্পন্না ও ভাব পরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যেদিন বঙ্কিম বাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিলেন, সেইদিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল; উন্নতির স্রোত তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দরসে গলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু হইতেই বঙ্গবাসীগণ 'সক' করিয়া বাঙ্গালা বই পড়িতে শিখিয়াছে।' এই সময়ে ঢাকায় পিতার চারি পোয়া প্রতিষ্ঠা হইল। * *

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির রস আমরা পিতাপুত্রে লোফালুফি করিয়া উপভোগ করিতাম। সেক্‌সপিয়ারের নাটকের রস তাঁহার পাদমূলে বসিয়াই উপভোগ করিয়াছি।"

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)—কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একখানি গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন—নাম 'আমার জীবন'—৫ খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে কবি আত্মজীবনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে তৎকালীন অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের অল্প বিস্তর অনুশীলনও ইহাতে

পাওয়া যায়। সে হিসাবে 'আমার জীবন' পুস্তকের কয়খণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যিকের বড় মূল্যবান পুস্তক। আমার জীবন ইতিহাসের সার্চলাইট, রাজনৈতিক দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ ও স্বদেশ প্রেমের পূতভরঙ্গ। পুস্তকখানির ভাষা বড় প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। বিলাতী সাহিত্যে Confessions of Rousseau, Pepys's Diary, Franklin's Autobiography প্রভৃতি অনেকগুলি আত্ম-জীবনচরিত থাকিলেও বাঙ্গালায় এই ধরণের পুস্তক অতি বিরল। পূর্ব্বোক্ত কুমুদ নাথ দাস বলিয়াছেন "Amar Jiban (My life) and Prabaser Patra (Letters from Abroad) are two principal prose works of the poet of which both are interesting, though one should very much wish that the auto-biography were free from all touches of egotism which occasionally disfigure it" কবির কাব্যগ্রন্থ সমূহ আমাদের এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করা হইল না।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৮৮৬)—

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস, নানা প্রবন্ধ প্রভৃতির রচয়িতা। ইঁহার পদ্য রচনাও অনেক ছিল। ইনিও বঙ্কিম চন্দ্রের সমসাময়িক লোক। ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য সম্পদ আরও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। ইঁহার রচনার শক্তিও যথেষ্ট ছিল।

কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪৬—১৯১৫)—

কালীবর বেদান্তবাগীশ দর্শন সম্বন্ধীয় জটিল সংস্কৃত পুস্তকগুলিকে যথাসম্ভব বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া মাতৃবাঙ্গালা

ভাষাবিদ্‌গণের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন, শুক্রশাস্ত্র, চরিত্রানুমানবিদ্যা সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন, বেদান্তসার, পূর্ব্বমীমাংসার্থ-সংগ্রহ, বেদান্তসংজ্ঞাবলী, পরলোকরহস্য, কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)—

শিবনাথ শাস্ত্রী মেজ বৌ, যুগান্তর, বিধবার ছেলে, নয়নতারা, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ প্রভৃতির রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত ইহার কবিতা রচনাও আছে; তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। ইঁহার আত্মচরিতও বাঙ্গালাভাষার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি একজন সুবক্তা ছিলেন; ইহার বক্তৃতা যেমন সারগর্ভ তেমনই হৃদয়গ্রাহী। ইনি ব্রাহ্ম হইলেও ইহার রচনা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জ্জিত।

শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসে লেখকের সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ণনাশক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রকৃত কোন সংযোগ বা সামঞ্জস্য মোটেই পরিস্ফুট না হওয়ায় উহা শিল্পের আকার-প্রকার গত 'ব্যক্তিত্ব' হিসাবে নিদারুণ ভাবেই খণ্ডিত এবং পণ্ড হইয়া গিয়াছে।" *

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)—

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মভূমি মাসিকপত্রিকায় অনেকগুলি সার-গর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইঁহার অগ্রজ ভ্রাতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে ইনিই প্রথম বিশ্বকোষ নামক সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদন আরম্ভ করেন। ইংরেজী, হিন্দী, উড়িয়া পার্শী, উর্দ্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায়

* বাণীমন্দির—পৃষ্ঠা ২০৩-৪

ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা দিগম্বর, মুক্তামালা প্রভৃতি ইঁহারই রচিত। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুল পাঠ্য গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ—Art Manufactures of India.

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯)—

ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইলেও বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্র দত্তের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার, সমাজ প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করেন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগ প্রবাসে ব্যয়িত হইলেও সংসার এবং সমাজে ইনি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ঘটনাবলীর যেরূপ নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ইঁহার তীক্ষ্ণদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ লইয়া যে তুমুল সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তাহার ছায়া বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁহার বিষবৃক্ষ প্রভৃতি পুস্তকে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; শিবনাথ শাস্ত্রীর পুস্তকেও এ আন্দোলনের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ লইয়া হিন্দুসমাজে সে সময়ে একটা তুমুল আন্দোলন তুলিয়া গিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের নাম ঐতিহাসিক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্কিমের অনুকরণে লিখিত ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও নিন্দনীয় নহে। এতদ্ব্যতীত ইনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন—তাহা 'ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ'; ইহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের

ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। ইঁহার অপর গ্রন্থের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও হিন্দুশাস্ত্র ২ ভাগও উল্লেখযোগ্য।

সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮–১৯১৭)—সারদাচরণ মিত্র উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ ও কায়স্থকারিকা নামক একখানি সামাজিক পুস্তক লিখিয়াছেন। ভারতে একলিপি বিস্তারার্থ ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজিয়তি ত্যাগের পর ইনি বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী সটীক সংস্করণও প্রকাশিত করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)—অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট গৌরব-বৃদ্ধি করেন। ইঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীর চরিত, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, প্রিয়দর্শিকা, সবুজ সয়তান, অলীকবাবু, বেড়ালের স্বর্গ, মা, খুকুমণি, ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, অভিশপ্ত বাড়ী, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অশ্রুমতী, মিলিতোনা, সত্যসুন্দর মঙ্গল—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি সে সময়ে লোকে আদর করিয়া পড়িত। ইনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত।

প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯০০)—প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীক ও হিন্দু, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, মণিহারী, অনুভূতি প্রভৃতি সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১): বাঙ্গালা সাহিত্যে

ব্যঙ্গরসাত্মক হাস্যোদ্দীপক রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন সার্ভেন্টিস বঙ্গসাহিত্যে তেমনি ইন্দ্রনাথ। ইঁহার চিরপ্রসিদ্ধ পঞ্চানন্দ অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার হইলেও ইহাতে যথেষ্ট গবেষণাপূর্ণ জিনিষও আছে। ইঁহার কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, পাঁচুঠাকুর, পঞ্চানন্দ (মাসিক পত্র) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের চির আদরের জিনিষ। ইনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ে প্রখরদৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঙ্গরসাত্মক লেখক সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের রচনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুর ব্যঙ্গ রচনা নিতান্ত সেকেলে ধরণের; তারপর ইন্দ্রনাথ ও বঙ্গবাসী সম্পাদক যোগেন্দ্র বসু; আর আমাদের বর্ত্তমানের রসের শুঁড়া রসিক চূড়ামণি ললিত বিদ্যারত্ন। অবশ্য ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যঙ্গরস, হাস্যরস প্রত্যেকের রচনাতে থাকিলেও প্রত্যেকেরই প্রভূত মৌলিকতা আছে। শেষজীবনে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালা ও ব্যাকরণ সংস্কার লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া ছিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯—১৯০২)—কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) বঙ্গভাষাকে অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন; তন্মধ্যে গীতার্থ সন্দীপনী, টীকা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভক্তি ও ভক্ত, পরিব্রাজকের বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি, রাম গীতা, পরিব্রাজকের সঙ্গীত, নীতিরত্ন মালা, পঞ্চামৃত, প্রবোধ কৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী, যোগ-ও যোগী, স্বপ্নতত্ত্ব, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা-বলীতে যেমন উচ্চভাব তেমনি প্রাঞ্জল তেজস্বী ভাষা পরিলক্ষিত হয়।

রজনী কান্ত গুপ্ত (১৮৪৯—১৯০০)—দরিদ্রের সন্তান হইয়াও রজনীকান্ত গুপ্ত আজীবন সাহিত্য পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেব চরিত সন ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা স্যর শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত সাহিত্যামোদী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও, কোন চাকুরী লইলে পাছে সাহিত্যচর্চ্চার বিঘ্ন বা অসুবিধা ঘটে এইজন্য সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ৫ভাগ ইঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ; ইহার ভাষা, রচনাপ্রণালী ও ঐতিহাসিক সত্যাসত্য বিচার বিশেষ প্রশংসনীয়। এইজন্য এখানি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। ইহার ভাষা যেমন ওজস্বিনী তেমনি প্রাঞ্জল।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' নামে বালকগণের পাঠোপযোগী প্রথম পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপরে বালকগণের পাঠের জন্য ভারত প্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, প্রতিভা, বীরমহিমা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সন ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছিলেন "স্বাধীন ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক, তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথমগ্রন্থ জয়দেব চরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

* * ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সংকল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায়, তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

* * * ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। * * জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনী কান্তের মূলমন্ত্র ছিল। * * রজনী যেমন একদিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জলবর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতীয় গৌরব খ্যাপনের সহিত জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা করিয়া, আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়া ছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারত কাহিনী, প্রবন্ধ মঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল।

* * * তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। * * তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত ; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। * * *

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল।"

রজনীকান্তের অন্য গ্রন্থের মধ্যে বোধবিকাশ, ভারতের ইতিহাস, হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়, মেরী কার্পেন্টারের জীবনী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের জাতীয় প্রেম, ঐতিহাসিক পাঠ, নব চরিত, প্রবন্ধকুসুম, প্রবন্ধমঞ্জরী, প্রবন্ধমালা, বিবিধ প্রবন্ধ, ভারতকাহিনী, রচনামালা—উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-?)—রসায়ন বিজ্ঞান, রামকৃষ্ণের জীবনী, দুইভাগ বক্তৃতা, তত্ত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করেন। ইনি পরমহংসদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়ভক্ত ছিলেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—(১৮৫২—১৯০৭)—দামোদর মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণকার পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন ইঁহার মাতুল ছিলেন। দামোদর মাতুলালয়েই শিক্ষালাভ করেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস মৃণ্ময়ী—বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার উপসংহার। অতঃপর মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী বিমলা, কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, নবাবনন্দিনী (দুর্গেশ নন্দিনীর উপসংহার), প্রতাপসিংহ, আদর্শপ্রেম, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, সুকন্যা, শম্ভুরাম, ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ইঁহার কমলকুমারী (স্কটের Lammermoor এর বঙ্গানুবাদ) এবং শুক্লবসনা সুন্দরী, ১ম, ২য়, ৩য় (Wilkin Collins এর Woman in White এর বঙ্গানুবাদ)—দুইখানি অনুবাদ হইলেও বাঙ্গালায় সুখ পাঠ্য বটে। এতদ্ব্যতীত ইনি ৯টি টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৩৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিরাট সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

উমেশ চন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২—১৮৯৮)—হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ

প্রণেতাদিগের মধ্যে উমেশচন্দ্র বটব্যাল অন্যতম। ইঁহার সাংখ্যদর্শন, বেদ প্রকাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। বৈদিককালে গোহত্যা বিষয়ক সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা—ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচনার একটী প্রধান গুণ এই যে তিনি প্রায়ই নূতন কথার অবতারণা করিতেন। পুরাতন কথার বার বার উল্লেখ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিতেন না ইনি পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন; এমন কি এক সময়ে নাস্তিক ভাবাপন্নও হইয়াছিলেন।

অমৃত লাল বসু (১৮৫৩–১৯২৯)—

অমৃত লাল বসু একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাটককার। হাস্যরস-প্রধান অভিনয়ে ও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইঁহার রসিকতা বড় স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। ইঁহার বক্তৃতায় বিমল হাস্যরসের সহিত গভীর ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি যেমন সুবক্তা তেমনি সামাজিক চিত্র অঙ্কনে সুনিপুণ। সামাজিক কুরীতি ও কুনীতি অপনয়নার্থে ইনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও তৎপ্রতি তীব্র ব্যঙ্গরূপ কশাঘাত করিতে সতত উদ্‌যুক্ত থাকিতেন। ইনি বাঙ্গালায় ব্যঙ্গরচনার এক নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। সুনিপুণ অভিনেতারূপেই ইঁহার খ্যাতির সূত্রপাত হইলেও ইনি একজন সাহিত্যরথী ছিলেন; ইনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩–১৯৩১)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রত্ন-তত্ত্বের অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইনি অনেক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ইনি বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। ইঁহার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে বাল্মীকির জয়, বৌদ্ধ ইতিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা,

সাহিত্য সমালোচনা, ভারত মহিলা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, মেঘদূত, কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, সমাজ সংস্কার নিবন্ধরাজি, কালিদাসের ব্যাখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "ইহার বাল্মীকির জয় গদ্য গ্রন্থ হইলেও একখানি ক্ষুদ্র মহাকাব্য।" প্রাচীন জাতিতত্ত্বে ইঁহার যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ইনি অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার মেঘদূত বঙ্গসাহিত্যের কোহিনুর; ইহাতে তিনি মেঘদূতের কবিত্ব সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন; কালিদাসের চিরমধুর কবিতার অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি ভক্তিগদগদচিত্তে অনুশীলন করিয়াছেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৩—?)—

বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসীম। ইঁহার রচনার মধ্যে বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, রাণী ভবানী, বঙ্গের ইতিহাস, বেদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'পৃথিবীর ইতিহাস'কে অনেকে ইঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া থাকেন।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু (১৮৫৪—১৯০৫)—

বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সহিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। দেশীয় ভাব ও ইউরোপীয় আদর্শ লইয়া বঙ্গবাসী পরিচালন করিয়া ইনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন। মডেল ভগিনী, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, নেড়া হরিদাস, চিনিবাস-চরিতামৃত, বাঙ্গালী চরিত, মহীরাবণের আত্মকথা, কালাচাঁদ প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচনা। ইনিও প্যারীচাঁদ মিত্রের মত স্বপ্রণীত গ্রন্থে স্বনাম প্রকাশ করেন নাই। ইঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে ইঁহার ভাষা যেমন

সরল তেমনি হৃদয়স্পর্শী, যেমন তীব্র তেমনি মধুর। ইনি নিজের রচনার দ্বারা তৎকালীন সমাজের কুরীতি কুনীতি সমূহ দূরীকরণার্থে সাধ্যমত প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই জন্যই "ইহার রচনা এত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভরা। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি ইনি তীব্র শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতাও যথেষ্ট। ইঁহার রচনায় ও ভাবে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। প্রতিভাবান লেখক মাত্রেই ভাষা ও ভাবের নূতনত্ব সৃষ্টি করেন। যোগেন্দ্র বাবুর ভাষাও নূতন, চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতিও নূতন। অল্প কথায় বলিতে গেলে ইনি একজন প্রতিভাবান তেজস্বী লেখক। ইনি ভণ্ডদিগের উপর তীব্র কশাঘাত করিতেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের অষ্টম বার্ষিক স্মৃতিসভায় অধ্যাপক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন: "প্রাচীন-গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়া তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে, সদ্ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * নীচ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন নাই। সমাজের কল্যাণের জন্যই তিনি এই বিপৎসঙ্কুল পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন: "তিনি শুধু সাহিত্য-সেবা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গতানুগতিক সাহিত্যস্রোতের প্রবাহ-পন্থা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য সেবায় কর্ম্মের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। * * *

সাহিত্যে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা দূর করিয়া নবীন আদর্শ দিয়াছিল; সমাজে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ নীচতা, সঙ্কীর্ণতা,

গ্লানি ও ভণ্ডতার উপর শ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কশাঘাত প্রযুক্ত করিয়া ভ্রষ্টাচার ও ভক্তগণকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিয়াছিল ; ধর্ম্ম জগতে হিন্দুর সদাচার নিষ্ঠা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া—ভারতের অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। * * *

'বঙ্গবাসী'র উপহারচ্ছলে একরূপ বিনামূল্যেই তিনি পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের গৃহে গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন,—যাহার প্রসাদে দেশে এত সাহিত্যচর্চ্চা, এত সাহিত্যিকের সৃষ্টি, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত সম্পদ্ এত ঐশ্বর্য্য। যোগেন্দ্রবাবু নিজহস্তে ভাণ্ডার-দ্বার না খুলিলে আমাদের সে ঐশ্বর্য্যের উপভোগ ঘটিয়া উঠিতে [উঠিত ?] না। এক কথায় তিনি আমাদের ধর্ম্মচর্য্যায় ও বাণী-বন্দনায় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বঙ্গ-ভাষার অতুল সম্পত্তি—বাণীচরণে অম্লান কুসুমস্তবক। তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি, ভাষা-বিন্যাস ও বর্ণনা-চাতুর্য্য কিসের কথা বলিব ? সবই প্রশংসার অতীত। 'মডেল ভগিনী'তে তিনি পাশাপাশি পুণ্য ও পাপের চিত্র আঁকিয়াছেন। একদিকে বিলাস-গর্ব্বিত বিদেশীয় কুশিক্ষার কুফল, অন্যদিকে অকপট ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুত্বের অম্লান পুণ্য-জ্যোতিঃ। 'মডেল ভগিনী' সমাজের বিকৃতপুরুষ-হৃদয়ে নির্দ্দয় আঘাত করিয়াছে। তাঁহার 'রাজলক্ষ্মী' সর্ব্বরসের সমন্বয়। কাত্যায়নী অন্নপূর্ণায় করুণরস, প্রভুভক্ত রঘুদয়ালে বীররস, ভক্ত রাধাশ্যাম ও দীনদয়ালের চরিত্রে শান্তরস আর রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে সতীজন-সুলভ রৌদ্ররস পরিপুষ্ট হইয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু 'চিনিবাস-চরিতামৃত' ও 'বাঙ্গালী-চরিতে' নব্য কুশিক্ষায় বিকৃতরুচি যুবকগণের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যর্থ ও অন্ধ উত্তেজনাকে

যাঁহারা দেশহিতৈষিতা ও অসার বাক্‌পটুতাকে যাঁহারা বীরত্ব বলেন, যোগেন্দ্রবাবু তাঁহাদের প্রতি কশাঘাত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা কিছু মৌখিক, আড়ম্বরময়, বাগ্‌বহুল ও কর্ম্মহীন, তাহাই তাঁহার ঘৃণার বস্তু ছিল। তাই তিনি নীরবে কর্ম্মের সেবা করিতেন। তিনি সাহিত্য-মন্দিরে ফুল-লতা-পাতা আঁকিতে আইসেন নাই—তিনি তাহার স্তম্ভ-প্রাচীর তুলিতে আসিয়া ছিলেন। * * *

যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মভাব, সরলতা, স্বদেশপ্রিয়তা, সৎপ্রবৃত্তি ও সাধু উদ্দেশ্যের লক্ষণ বিদ্যমান আছে।"

"তাঁহার মত স্বভাবসিদ্ধ সরস সরল অন্তর্গূঢ় ব্যঙ্গাত্মক রচনা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখা যায়। * * যে সকল ক্ষণজন্মাপুরুষ আপনাদের সর্ব্বস্বদান করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন।"

"তিনি আজ স্বর্গগত; কিন্তু তাঁহার শক্তি আজ বঙ্গের সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কর্ম্মশীল রহিয়া তাহাদিগকে আজিও সঞ্জীবনী সুধা দান করিতেছে। * * তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গবাসী; দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সুলভে শাস্ত্রপ্রকাশ।"

কৈলাস চন্দ্র সিংহ (১৮৫৫-১৯১৮)—

কৈলাস চন্দ্র সিংহ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, সেনরাজগণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুস্তক রচনা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫৫-১৮৯৩)

কবি রাজকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্র নাথের মত একজন বহুগ্রন্থ লেখক। নাটক, উপন্যাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রভৃতি ইনি

অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতিক্রত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহার প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক এককালে বহুদিন ধরিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইঁহার গদ্য রচনার মধ্যে দুই শিকারী, প্রতিফল, জ্যোতির্ম্ময়ী, হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ী উল্লেখযোগ্য।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৮৯৭)—

ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগেশ' নামে একখানি উচ্চ অঙ্গের কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কাব্য বা কবিতা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। তবে 'সুধাময়ী' নামে ইঁহার একখানি উপন্যাসও ছিল।

নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫-১৯০১)

নীলকণ্ঠ মজুমদার গীতারহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম্ম প্রভৃতির রচয়িতা। ইনি এক অভিনব প্রথায় গীতার নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহ সরল ও সহজভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দুই বন্ধুতে কথোপকথনচ্ছলে ঐ সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বিষয়টী দুরূহ ও দুর্ব্বোধ হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজ ও উপাদেয় হইয়াছে।

বিহারী লাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১)—

বিহারী লাল সরকার একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবী। ইঁহার শকুন্তলাতত্ত্বে পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাস বর্ণিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের তুলনা অনুশীলিত হইয়াছে। ইংরাজের জয়ে ক্লাইভ কর্ত্তৃক আর্কট অবরোধ ও বিজয়লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর

নামক গ্রন্থে ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত ও সমসাময়িক ঘটনাবলী সরলভাষায় সবিস্তারে ও নিখুঁতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইঁহার গানের ও কবিতারও গ্রন্থ আছে। তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। ইঁহার অনুসন্ধিৎসা, ইঁহার সমালোচনাশক্তি, ইঁহার ইতিহাস ও সাহিত্যের গভীর জ্ঞান—বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচনা যেমন সরল তেমনি উচ্চভাবপূর্ণ। ইঁহার অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তিতুমীর। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা সকলেরই পরিচিত।

নিখিল নাথ রায় (১৮৫৬-১৯৩২)

নিখিল নাথ রায়ের নাম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক বলিয়াই বিখ্যাত। ইঁহার রচনার মধ্যে মুর্শিদাবাদ কাহিনী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, প্রতাপাদিত্য, ইতিকথা, মরণ রহস্য, বারই ডিসেম্বর, কবিকথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)

স্বদেশপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত ইংরেজীতে পণ্ডিত হইয়াও বঙ্গভাষাকে কয়েক খানি মুল্যবান ধর্ম্মপুস্তক উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে ভক্তি-যোগ, প্রেম ও দুর্গোৎসব তত্ত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭)—

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রাজ নারায়ণ বসুর সুযোগ্য পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, পতিব্রতা গ্রন্থাবলী, সীতা অহল্যাবাঈ, তুকারাম চরিত প্রভৃতির রচয়িতা। তন্মধ্যে মধুসূদনের জীবন চরিত ইঁহার কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী বলা যাইতে পারে। এরূপ জীবন চরিত তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ রচনা করেন

নাই; এমন কি আজ পর্য্যন্ত এরূপ জীবন চরিত আর একখানিও রচিত হয় নাই। সেকলের ভাষায় বলিতে গেলে—বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উপন্যাস রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গিরিশচন্দ্র যেমন নাটক রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যোগীন্দ্রনাথ সেইরূপ বঙ্গীয় জীবন চরিত রচয়িতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "He has no second" এই পুস্তকে তিনি মেঘনাদ বধে বর্ণিত প্রত্যেক চরিত্র অসামান্য যোগ্যতার সহিত বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯১১)—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্যা বিদুষী কন্যা—দীপ নির্ব্বাণ, বসন্তোৎসব, মালতী, গাথা, হুগলীর ইমাম বাড়ী, মিবাররাজ, বিদ্রোহ, নবকাহিনী, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, ফুলের মালা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী—স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহার দীপনির্ব্বাণ দুর্গেশনন্দিনীর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য, ইনিই প্রথম মহিলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ "জগত্তারিণী" পদক লাভ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দান যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৭—১৯১৭)—

বিদ্যাসাগরজীবনীপ্রণেতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরমার গৃহ, মা ও ছেলে, জীবন সোপান, কমলকুমার, অদৃষ্টলিপি, দুখানি ছবি, বাসুদেব জীবনী, অমরধাম, দেবগণের ভারত ভ্রমণ প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিয়া বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৫৮—১৮৯৪)—বাঙ্গালাভাষায়

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রচনার এবং বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসারের দরুণ প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করার দরুণ জগদীশচন্দ্রের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রথম পুস্তক 'হোমিওপ্যাথী মতে গৃহ চিকিৎসা'; "এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারেন।" দ্বিতীয় পুস্তক 'হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন'; তৃতীয় 'ওলাউঠা চিকিৎসা'। "বঙ্গভাষায় হোমিওপ্যাথি মতে ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক ইহাই সর্ব্বপ্রথম এবং পুস্তকখানিও সুন্দর"। চতুর্থ পুস্তক 'নরশারীর তত্ত্ব'; পঞ্চম 'জ্বর চিকিৎসা,' অতঃপর 'চিকিৎসা তত্ত্ব'; ভৈষজ্য তত্ত্ব এবং 'সদৃশ চিকিৎসা' নামক সুবৃহৎ 'প্র্যাকটিস অব মেডিসিন' লিখিতে থাকেন। ইঁহার ভৈষজ্য তত্ত্ব ডাক্তার হেরিঙ্গ সাহেবের মেটিরিয়া মেডিকার বঙ্গানুবাদ; ইহা একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯০৯)—

প্রেমপ্রতিমা, বিমাতা, বড় ভাই, আমাদের ঝি, ঠাকুর ঝি, কলঙ্কিনী, গল্প গুজব, বাংলা মেয়ে, প্রসন্নকান্তের উইল, উপন্যাস লহরী, চা কুলীর আত্মকাহিনী, কনে বৌ, খুড়িমা, পাহাড়ী বাবা প্রতিশোধ, চিত্র প্রভৃতি বহু উপন্যাস লেখক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনার জন্য ইঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৫৯—১৯১৩)—

তন্ত্রতত্ত্ব, গীতাঞ্জলি, মা, স্বভাব, ও অভাব, কর্ত্তা ও মন, বিদ্যার্ণবের দুর্গোৎসব, গঙ্গেশা প্রভৃতি প্রণেতা শিবচন্দ্র

এই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বঙ্গসাহিত্য সাম্রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র

সম্রাট; তখন তাঁহার যশঃ সৌরভে বাঙ্গালা ভরপূর। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য ছিল, তিনি নিজের অতুল প্রতিভাশক্তি দ্বারা সে সমুদয়কে স্ববশে আনিয়া, নিজেকে সেই বিস্তীর্ণ সম্মিলিত বাঙ্গালা সাহিত্য সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত নেতা বা অধীশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজি সাহিত্যে জন্‌সনের যুগে যেমন ডাক্তার জন্‌সন্‌, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। জন্‌সনের যুগে আমরা ইংরেজি সাহিত্যে Burke. Robertson, Wartons, Gray, Mason, Gibbon, Adam Smith, Beattie, Sir William Jones, Goldsmith, Churchill, Reynolds, Geard Hamilton, Beauclerk, Langton, Windham, Boswell, Mrs. Thrale, David Garrick প্রভৃতি বহুসংখ্যক মনীষী লেখক ও সাহিত্যিকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই, বঙ্কিমের যুগেও তেমনি বাঙ্গালা সাহিত্যে কালীসিংহ, কেশব সেন, শিশির ঘোষ, বীরেশ্বর পাঁড়ে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গিরিশ ঘোষ, তারক গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীচরণ সেন, রামদাস সেন, অক্ষয় সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশ দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনী গুপ্ত, অমৃত বসু, যোগেন্দ্র বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ মনীষীলেখক ও সাহিত্যিক এককালে বিরাজমান দেখিতে পাই। সৌরজগতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে যেমন সূর্য্য, তেমনি জনসনের যুগের উল্লিখিত লেখকগণের মধ্যে স্বয়ং জন্‌সন্‌ ও বঙ্কিমের যুগে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

বর্ত্তমান যুগ

আমাদিগের পূর্ব্বলিখিত যুগবিভাগ অনুসরণ করিলে রবীন্দ্রনাথের যুগই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ। বলা বাহুল্য, এই যুগের অধিকাংশ লেখকই এক্ষণে জীবিত; জীবিত ব্যক্তির রচনাবলীর সম্যগ অনুশীলন সমীচীন নহে, সম্ভবপরও নহে; সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের বা সাহিত্যিকগণের সংক্ষেপে অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই যুগে এত অধিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে যে এই যুগের বাঙ্গালা গদ্যের সম্যগ্ অনুশীলন করিতে হইলে ইহাকে তিনটী উপবিভাগে ভাগ করা সমীচীন মনে হয়। এই তিনটী উপবিভাগ যে প্রথমটীর পর দ্বিতীয়টী এবং তৎপরে তৃতীয়টী, তা' ঠিক নহে। বস্তুতঃ, এই তিন উপবিভাগ সময়ের অনুক্রম হিসাবে নহে; এই দীর্ঘযুগের সমগ্র সাহিত্য-সমষ্টিতে তিন জন সাহিত্যিক মহারথীর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়——

রবীন্দ্র সম্প্রদায়ের ভাষা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—)—

স্বনাম ধন্য বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-সম্রাট কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক। একদিন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়া

বলিয়াছিলেন—তিনি 'ভাষার মুখে খড়ের নুড়ো জেলেছেন'।" অন্য এক সমসাময়িক কবি রঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাষা ইংরাজীতে ভাজা। ড্যাফোডিল পুষ্পে যেন মনসার পূজা॥" বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত বঙ্গভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। তবে, তিনি যে এক অসীম প্রতিভাশালী লেখক তাহা অস্বীকার করিবে কে? তিনি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রেব মত নানা বিষয়িণী অসংখ্য রচনা দ্বারা তাঁহার অসীম শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, উপন্যাস, গান, কাব্য, ধর্ম্মতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব—সকল বিষয়ক বহু সংখ্যক সারগর্ভ প্রবন্ধ হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অধিক করিয়া ইঁহার পরিচয় দেওয়া বর্ত্তিকাসাহায্যে সূর্য্যদর্শনের মত।

"Thə psychological novel in Bengali Literature has Rabindranath as pioneer, for his *Naukadubi* and *Chokcr Bali* (specially the latter) show the innate tendency of the poet in revealing his plot through the analysis of the emotions of the *dramatis personae*. His early attempts in the range of the novel (viz. *Bauthakuranir Hat*) weɪe attempts in the manner of Bankim chandra and could not be said to have achieved great success. His later works—*Gora* and *Ghare Baire*—sustain his reputation as a novelist. * * * Rabindranath is one of 'the world's

greatest short story writers'. His stories delineate figures and faces so true and life-like, so sparkling and animated, so rich in variety and beauty, that they seem to be a world by themselves created by the will of a great enchanter.

'This writer or that has surpassed Rabindranath in some quality or other. But where are we to find a writer of stories so different and so good as Hungry stones, Living or Dead, Subha, Cloud and Sun, The Kingdom of Cards, The Trust Property, The Riddle Solved, and ths Elder 'Sister? Four of these eight are of the deepest tragedy, a very unusual feature in an Indian writer; two are of tragedy of a less mixed and absolute kind; but sufficiently poignant, with irony salting the bitterness and with tender laughter softening the pathos; one deals with a pathos of sheer phantasy, two are ghastly, several are masterly psychological studies'—Thompson.

As an essayist, Rabindranath is also a remarkable figure. His critical expositions of Valmiki's *Ramayana*, Kalidasa's *Sakuntala*, *Kumara Sambhava* and *Megha-duta*, Bana's *Kadambari*, and apprecia-

tions of Vidyapati, Rammohan, Devendranath, Bankim, Biharilal, Dwijendralal and others, his essays on Beauty, Morality, Folk Literature, National Education, &c. his dissertations on politics, theology and sociology are all products of a master-mind and may fairly bear comparison with the best essays of European writers. * * *

He has for the first time imparted literary grace to letter-writing, and produced prose-poems in our language. His autobiography also 'the world will not let willingly die' "—History of Bengali Literature by Kumudnath Das.

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষাপরিচর্য্যা পাশাপাশি তুলনা করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস বঙ্গশ্রীর ১৩৪১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"ভাবকে ভাষার অধীন না করিয়া, ভাষাকে ভাবের অধীন করিয়া—সাহিত্যের যাহা প্রধান ধর্ম্ম, সেই প্রকাশশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়া, বৈয়াকরণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের অতিরিক্ত শুচিবায়ু রোগ পরিহার করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাগদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভাষাকে জীবধর্ম্মী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে নিরন্তর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া সেই জীবন্ত বাণীদেহ রবীন্দ্রনাথের যুগে সুদৃঢ় সুবলিয়িত ও সুনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "জন্ম-পারক

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে মনুষ্যের আধুনিক ভাষা ও ভাব-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নানাদিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। * *

এখনও তাঁহার সম্যক আলোচনার সময় আসে নাই। সে সময় বহুদূরবর্ত্তী থাকুক—বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভায় কৃতার্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হউক! রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে সকল মৌলিক উপকরণ ও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি কিংবা লেখক পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নব নব পথে খেলিতেছে। তিনি বঙ্গীয় খণ্ড কবিতার সাহিত্যকে এমন শব্দসম্পৎ, সত্য ও সৌন্দর্য্যের উপাদান, রচনার কারুকার্য্য, চরণের মাধুর্য্য, অলঙ্কারের পরিপাট্য ও ছন্দের শত সহস্র প্রকার বৈচিত্র্যে ভূষিত করিয়া যাইতেছেন যে, বঙ্গভাষা এই ক্ষেত্রে স্পর্দ্ধা করিয়া পৃথিবীর অন্য সাহিত্যকে আপন কুটীরে একবার নিমন্ত্রণ করিতে পারে। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আমরা জগতের আধুনিক সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি। * * ইহা বঙ্গভাষার অল্প গৌরবের কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্টতার মূলকারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়, এমন কি সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বকীয় শক্তির অনুসরণ করিতেছেন। * * *

[রবীন্দ্রনাথ] বঙ্গ-জীবনের উদ্যান হইতে ক্ষুদ্র গল্পের 'গন্ধপত্র'ময় পুষ্পচয়ন করিয়াছেন; দেশের পূর্ব্বাপর কাহিনী-কথার মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবরসের আস্বাদ লইয়াছেন; দেশের ধর্ম্মনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক নিজের স্বপ্নাবেশ-বিহ্বল তত্ত্ব-ভাবুকতায় অবগাহন করিয়াছেন; সমাজ এবং পরিবারের ক্ষেত্রেও

প্রবেশ করিয়া অভিনিবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিয়াছেন; আসঙ্গ-লিপ্সা নামক পদার্থটাকে টুকুড়া-টুকুড়া করিয়া কাটিয়াছেন; অনুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন; দাম্পত্য প্রেমকে নৌকাডুবি করিয়া একেবারে ডুবাইয়া দিয়া, ক্রমে ছায়াসঙ্কেত এবং অপরিস্ফুট অনুভবের মধ্য দিয়া তাহাকে আবার নবজীবনে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন; বর্ত্তমান ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ মধ্যে 'জাতীয় জীবন' নামক পদার্থকে অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ পূর্ব্বক উহাকে সোজাসুজি 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' দরজা দেখাইয়া দিয়া, স্বয়ং শান্তি-নিকেতনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; হিন্দুসমাজের অচলায়তনের প্রাচীন পাকা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সমাজ সভ্যতার সূর্য্যালোক প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * *

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে বহুরূপী, এবং তিনি আধুনিক খণ্ড কাব্যের অনেক বিভাগের ন্যূনাধিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কতরূপে কতভাবে দেখা দিয়াছেন—দিতেছেন, এখনও তাহার বিরাম নাই। অতএব তাঁহার দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমানে সহজ নহে; সম্ভবও নহে। * * *

ছোট গল্পের এবং নবেলের ক্ষেত্রেও তিনি সবিশেষ জর্জ্জ এলিয়ট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যেঠে, পো মেরিডিথ, টলষ্টয় বিশেষতঃ ফরাশি কথা-লেখকগণকে (বেলজাক, গীঁদে মোপাসা, থিওফাইল গঁতিয়ে এবং এনাটোল ফ্রান্স প্রভৃতিকে) উদরসাৎ করিয়াই নিজের স্বাধীন মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াছেন। * * * রবি কবির আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া চিরকাল নির্দ্দিষ্ট হইবে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে, বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তঃসুপ্ত ভাবুকতা এবং দার্শনিকতাকে

নানাদিকে উদ্দীপিত করিয়া, নানাপ্রকার ছোট-বড় পরভৃৎ লেখকের আহার দাতা, এবং স্বাধীন কবিনিবহের শিক্ষা-স্থানীয় হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার আভ্যন্তরীন শক্তি এবং মাহাত্ম্য তাঁহার হস্তে নানাদিকে বর্দ্ধিত হইয়া উহার রুচি এবং সভ্যতার আদর্শকেও নানাপ্রকারে শাসিত করিতেছে। * * *

তাঁহার গদ্যে পদ্যে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র গল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে ফরাসী রীতি সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। ফরাসি নিয়মের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। * * *

বাঙ্গালীর হৃদয় যাহাতে আধুনিক ইউরোপের সর্ব্বপ্রকার ভাবনা-মহিমায় পরিচিত হইতে পারে, চিরজীবন সাময়িক পত্রিকার সম্পর্কে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ সে উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতেছেন! * * *

তিনি বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্য তত্ত্বের পুরোহিত—High priest of beauty এই সৌন্দর্য্যও বহুস্থলে কেবল যৌনভাবের সৌন্দর্য্য বই নহে। * * *

তাঁহার ক্ষুদ্র গল্প এবং চৈতালি, কথা ও কাহিনী এইরূপে প্রকৃতির মন্দিরে প্রত্যাগমনের দৃষ্টান্তই বহন করিতেছে। কিন্তু, চিরকাল যেন তাঁহার 'রাজার সাজ'। রাজবেশে প্রকৃতি-মন্দিরে অনেক সময়েই প্রবেশ করা যায় না। * * * তাঁহার ভাষার রাজবেশ, অলঙ্কারের ঝিকিমিকি, এবং শব্দসিঞ্জনের পারিপাট্য অথবা অত্যধিক মার্জ্জনার গতিকেও হয়ত দৃষ্টি ঝলসিয়া যায়—মনোযোগ স্থির করার পক্ষে অতিমাত্রায় পিচ্ছল বোধ হইতে থাকে। * * * 'নৌকাডুবি' তাঁহার একটি কবিত্ব সুন্দর পারিবারিক উপন্যাস। * * *

তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] দৃষ্টি ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব দর্শনেই সবিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে, মানব-চরিত্র অধ্যয়নের গভীরতায়, তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গীয় গল্পের বর্ত্তমান উচ্চতাও বুঝিতে পারা যায়। * * *

প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত; সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য—সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ! এত জাঁক জমক, এত বর্ণনার পারিপাট্য সাহিত্যে অল্প নাটকেই আছে। কিন্তু, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য এবং অন্তরতম পদার্থটীর অভাবে যেন সমস্ত বিফল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত আমাদের প্রকৃত সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে! সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত; এবং সঙ্গীত ভাবাক্রান্ত বাক্য-বিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল! * * *

[রবীন্দ্রনাথ] নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব শক্তির ফল উপাহরণ পূর্ব্বক কবিপদবী অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। * *

তাঁহার মধ্যে হয়ত মধুসূদনের শক্তি, হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট গৌরব কিংবা নবীনচন্দ্রের জ্বালাতরঙ্গময়ী ভাব প্রবণতা নাই; কিন্তু তাঁহার মধ্যে বঙ্গভাষার যৌবনোপযোগী এমন একটা তরলোজ্জ্বল লাস্যলীলা বা আনন্দের এবং কৌতুকের চমক আছে, সর্ব্বোপরি বাঙ্গালিজীবনের ক্ষুদ্র সরল বস্তু বিষয়কগুলিন অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের দিকে—অপ্রাপ্ত এবং অজ্ঞাত উদ্দেশে, এমন একটা অনির্ব্বচনীয় সঙ্কেত বা অস্পষ্ট

মধুর ঈষারা স্ফূরিত হইয়াছে যে, উহাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, প্রাচ্য সাহিত্যের তরফ হইতে, নব মাহাত্ম্য অধিকার সপ্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছে; এবং উহাই ১৯১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে! * *

কবি রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন গদ্যে পদ্যে এইরূপ দার্শনিকতার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন! তাঁহার প্রতিভা একদিকে যেমন সঙ্গীতের প্রতিভা, তেমন অন্যদিকে একটা দার্শনিকতার প্রতিভা; * * *"

উক্ত শশাঙ্কমোহন বাণী-মন্দির নামক পুস্তকে আরও লিখিয়াছেন:— "দেহের কামবৃত্তি এমন পদার্থ যে, কেবল একজোড়া স্ত্রীপুরুষ খাড়া করিয়া এবং তাহাদিগকে পরস্পর কামোন্মত্ত করিয়া তাহাদের গুহ্য গোপনীয় আলাপ ব্যবহার বর্ণনা করিতে গেলে, বিশেষ কোন কবিত্ব নাই, মানুষের দৈহিক স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়। এইরূপে ফলে, মানুষের কামবৃত্তির স্নায়বিক উত্তেজনা সাধন করাকেই এ সমস্ত আর্টিষ্ট ধরিয়াছেন 'সাহিত্যে সৌন্দর্য্য সাধন'। তাহার উপর, লেখকের ক্ষমতা থাকিলে, বিচিত্র প্রযোগ কৌশলে কখন বা চাপ দিয়া, কখন আস্কারা দিয়া এরূপ স্নায়ু উত্তেজনার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়া অসতর্ক ব্যক্তিকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিতেও বাধা নাই! এরূপে, পরস্পর ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীপুরুষের মশারিদৃশ্য অথবা অভিসার দৃশ্যের বর্ণন, তাহাদের কামক্ষুধার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিলাসলীলার উদ্ঘাটন—উহার নামই সাহিত্যে Sex psychology; এবং এইরূপে কল্পিত স্ত্রীপুরুষের হাবভাব ভঙ্গী ও আকার ইঙ্গিতের 'অনুবীক্ষণী' বিবরণ, উহাই হইল আধুনিক সাহিত্যের Realism ও Naturalism—অন্য কথায় সাহিত্যে

'বৈজ্ঞানিক রীতি'। * * আস্ত কামোদ্রেককেই 'সাহিত্যিক রসোদ্রেক, বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার নামই Art for Art's sake ; * *

এ আদর্শের জনক নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়—ফরাসী নবেল সাহিত্য। * *

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাহিরে' গল্পও ব্যভিচারাত্মক কামকেই প্রাধান্যতঃ আশ্রয় করিয়া আর্টের 'সৌন্দর্য্য' চয়ন ও রসসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে ফরাসী শিল্পীর 'সত্যবাদ' ও Art for Art আদর্শে উৎসাহী এবং সাহসী হইয়াই এতাদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন, তাহাতে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নবেলী শিল্পশক্তির অনেকগুলি বলবান্ লক্ষণ ইংরেজী অপেক্ষা বরং ফরাসী আবহাওয়াতেই সুসিদ্ধ করিয়াছেন। * *

কালিদাসের পর এমন সৌন্দর্য্যতন্ত্রী এবং আদিরসের এমন একাগ্র উপাসক কবি ভারতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচনায়, সত্য ও সৌন্দর্য্য সাধনায় যে প্রশান্ত ও নিবিড় দৃষ্টির ঘনফল উপচিত এবং প্রৌঢ় হইয়াছে, সাহিত্যজগতে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু বিস্তারিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে নামিয়া স্বধর্ম্মবিস্মৃত কবি ফরাসী আদর্শের আওতায় পড়িয়া কি বিড়ম্বনাই না ভোগ করিয়াছেন। * * উপর্য্যুপরি তিন তিনটী গল্পে কেবল ব্যভিচারের অনুচিন্তন করিয়াই চলিতে পারিয়াছেন! * *

মহেন্দ্র বিনোদিনী অথবা বিমলা-সন্দীপের নানাবিধ শৃঙ্গার চেষ্টার স্বপ্নোজ্জ্বল পরিবর্ণনা আমাদের যতই সুখ দিতে থাকে, স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া যতই 'বাহবা' লাভ করিতে থাকে, ততই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাত্মার নিভৃত প্রকোষ্ঠ হইতে যেন আর একটী কণ্ঠের

সৌম্য সূক্ষ্ম ধ্বনিও শোনা যায়, যাহাকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা অথবা সাধুবাদের 'উদ্গিরণ' বলিয়া কোনমতেই মনে করিতে পারি না। * *

রবীন্দ্রনাথের স্থায় ভাবুক এবং অন্তরাকাশ বিহারী পক্ষীট যেখানে বিষয় বস্তুর কদর্য্য মৃত্তিকাধর্ম্মে পঙ্ক কলঙ্কিত হইয়াছেন, তখন অন্যে পরে কা কথা! * *

ব্যভিচার আলোচনা সমাজে সকল ভদ্রবর্গের পক্ষেই ত অশ্রাব্য হইয়া আছে! * * যদি কোন ভদ্র বন্ধুসভায় বলিতে যাই 'শুনেছ, শুনেছ—আমাদের বন্ধুপত্নী বিধবা অমুক—অমুক বাবুর সঙ্গে'——তা' হইলে তৎক্ষণাৎ সুশ্রাব্য শুনিয়া এবং অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াই সে স্থান হইতে ফিরিতে হয়। আর যখন হাতে কলমে লিখিয়া অথবা ছাপা বই করিয়া, উহা হাতে লইয়াই উপস্থিত হই, অমনি পরম আদরের ব্যাসাসন পড়িয়া যায়, আর তাকিদ হইতে থাকে 'তাইত হে——তারপর!'—এই ত প্রকৃত অবস্থা! কোন ভদ্রমহিলা পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার—আমোদে লিপ্ত আছেন, উৎসাহাতিশয্যে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা করা দূরে থাকুক সঙ্কেত মাত্র করিতেও আমাদের ভদ্রতাবুদ্ধি বাধা প্রদান করে: ভদ্রসমাজের শ্রোতামাত্রে উহাতে বরং নিজেকেই অপমানিত মনে করিয়া রুষ্ট হইয়া থাকেন। ভদ্রসমাজে যাহা এতই বিগর্হিত, সরস্বতীমাতার পবিত্র মন্দিরে প্রবেশমাত্র তাহা কিরূপে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া এতই মনোরম্য এবং প্রকাম্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে? মুখে বলিতে গেলে যাহা এতই কুৎসিত এবং হেয় লেখনীর ক্ষেত্রে আসিয়া তাহা কিসে এতই সুধাবিনিন্দী এবং সুগন্ধি স্বরূপে ধাঁধা লাগাইতে পারে? 'There must be something in this state of Denmark!'

ফলতঃ মাদাম বোভারী, Red Lily, জুদারম্যানের Song of Songs এর Lily, মহেন্দ্র বিনোদিনী ও 'নষ্ট নীড়ে'র বউদিদি ——ইহাদের প্রত্যেকেই ত ঘোর অভদ্র, বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচোর এবং মিথ্যাবাদী! কামের উদ্রেকে যতই স্নায়ুসুখ জন্মিতে থাকে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে যতই কুতুহল চরিতার্থ হইতে থাকে, ততই পাত্র-পাত্রীর এত সমস্ত অভদ্র ও জুগুপ্সিত আচরণে আমাদের আত্মাপুরুষ লেখকের প্রতি অপরিসীম বিরুদ্ধ বুদ্ধি ও বিতৃষ্ণায় তিক্ত বিরক্ত হইতে থাকে। * * *

এক নৌকাডুবি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত নবেলগুলি—— নষ্টনীড়, চোখের বালি, ঘরে বাহিরে—পড়িতে বসিলে প্রতিপদে মনে হইতে থাকে যে, একজন পরম যৌন সৌন্দর্য্য রসিক কথাশিল্পীর, বিশেষতঃ যিনি কোন নীরস বাক্য উচ্চারণ করিতেই জানেন না এমন শিল্পীর রচনা মধুই পান করিয়া চলিতেছি! কিন্তু পান করিতেছি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ বস্তু? মানুষের একটা কদর্য্য কুৎসিত অধঃপতনের মনোরম বর্ণনা। * * *

'চোখের বালি' 'নষ্টনীড়' অথবা 'ঘরে বাহিরে'র ঘটনা সংবিধান হইতে একটা ফলিতার্থ এ'রূপ দাঁড়ায় যে, কোন শ্রেয়ঃকামী দম্পতী আপনাদের গৃহগণ্ডী মধ্যে দ্বিতীয় কোন গুণী, সুরূপ কিম্বা কোন দিকে 'চিত্তাকর্ষক' স্ত্রী অথবা পুরুষকে প্রবেশ করিতে দিবে না; নিজের কোন 'ভাই'কে বা অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বিশ্বাস করিতে নাই; পৃথিবীর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। অথচ স্বাধীনতা-প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে এরূপ 'পারিবারিক আদর্শ' পোষণ করেন বলিয়া ত কোনমতে ধারণা করিতে পারি না! * * তিনটি গ্রন্থেই

হিন্দুপরিবারের শুদ্ধান্তমন্দিরে আধুনিক আদর্শের 'স্বাধীনতা'র নূতন আবহাওয়া ঢুকাইয়া একই রকম দুর্ঘটনার উপন্যাস করিতে যাওয়াতে, বিশষতঃ একটা অসামান্য পাপাগুনকে অসতর্কভাবে নাড়া চাড়া করিতে যাওয়াতেই ভ কবির উদ্দেশ্য ও তাঁহার শিল্পের মর্ম্মার্থ যেদিকে সেদিকে বেয়াড়া হইয়া, দগ্ধিয়া যাইতেছে ; শিল্পের 'রস', 'অর্থ,' 'মর্ম্ম' ও 'শরীর স্থান' সমস্তকে—কবির অনিচ্ছাসত্ত্বেও—ছাইভস্মে পরিণত করিতেছে !"

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের অনুশীলন কালে শ্রীযুক্ত সোম নাথ মৈত্র লিখিয়াছেন —"প্রথম শ্রেণীর কবি গদ্যলেখক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেচেন এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত গদ্যে ও পদ্যে, যেদিকে প্রতিভা পরিচালিত হয়েচে সেই দিকেই সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করেচেন, অনেক সময় সাহিত্যের এইদুটি বাহনকেই জুড়িতে সমান তালে চালিয়েচেন, এমন লেখক জগতে কমই জন্মেচেন।

পাদ্রী টম্‌সন্ যাঁর কাছে থেকে শুনে তাঁর বইয়ে লিখেচেন যে 'These Torn Letters contain some of the best prose that he ever wrote,' তিনি বিচার শক্তিরই পরিচয় দিয়েচেন। ভাষার মধ্যে এত স্বচ্ছতা, এত নমনীয়তা ভাবের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বর্ণ বৈচিত্র্য প্রকাশে এমন উপযোগিত', সহজ অনাড়ম্বর সুষমার সঙ্গে এমন শক্তির সমন্বয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের কম দেখা যায়। * * * চিঠিতে তিনি দ্বিধামাত্র না ক'রে আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষা ব্যবহার করেচেন, কৃত্রিম সাধুভাষায় তাঁর নিবিড় অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ মনোভাব প্রকাশ করতে যাননি। এগুলি যদি চিঠি না হ'ত তা'হলে হয়ত

এসব কথা তিনি সাধুভাষাতেই লিখতেন,—সে আজ চল্লিশ বছরের কথা, যখন বঙ্গ সাহিত্য ছিল সাধু সাধুভাষারই মুলুক,—তা' সে ভাষার-জোর থাক আর না থাক। যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সাধুভাষার বহিষ্করণে ছিলেন অগ্রণী, চলতি-ভাষার সেই বিজয়ী সেনাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন যে, সাধুভাষা হচ্চে ধোপদুরস্ত, তার একটুও রং নেই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে তা স্বতঃই ফুলেও ওঠে এবং খড়্ খড়্ও করে। * * * কিন্তু বলবার কথা যেখানে গভীর অথচ একান্ত সরল সেখানে আমাদের চলতি ভাষা যে কতদূর উপযোগী এবং গুণীর হাতে তা কত সুরে বাজে তা এই চিঠিগুলি থেকে বুঝি। * * *" দৃষ্টান্ত স্বরূপ সোমনাথ বাবু একটা পত্রাংশও উদ্ধৃত করিয়াছেন ; 'পাড়া গাঁয়ের কর্ম্মস্রোত খুব বেশী তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি ক'রে চলেচে। খেয়ানৌকো পারাপার করচে, পান্থরা ছাতা হাতে ক'রে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেচে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্চে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় ক'রে হাটে আসচে, দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করচে, একটা ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিঙ্গি উল্টে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করচে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটি কতক গরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্ব্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটীর উপর প'ড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে, এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর ব'সে যখন বড় বেশি বিরক্ত করচে

তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্চে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ, ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ-ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণ কাতর নিনাদস্বর, সমস্ত কর্ম্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্চে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময়, স্বপ্নময়, করুণামাখা একটা বড় সঙ্গীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা।'

উক্ত সোমনাথ বাবু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র হইতে একটী জনহীন, তৃণহীন বালুচরের চিত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন; "দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূধূ করচে, তাতে না আছে গাছ না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের কাছে চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি না,—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশী শূন্য মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভ'রে যেতে পারত সেখানে একটী কুশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নেই,—কেবল একটা-উদাস, কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চ'লে যাচ্চে, ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকা, স্নানের লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্নে নদীর ধারের হাটের কলধ্বনি— দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা, কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটীর ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে সাদা। সন্ধ্যা বেলা সূর্য্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।"

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"ছোটগল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয় নির্ব্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে জীবনের এমন একটী খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্পপরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্র পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের ইহাতে স্থানাভাব। * * * ছোটগল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য। * * *

তাঁহার গল্পগুলি আমাদের কর্ণে এই আশার বাণী ধ্বনিত করে, যে, আমাদের বিষয় দৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্য আমাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, আমাদের রস-সম্পদের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির। * * *

তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্ক বৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ। আমরা এই চারিটী উপায়ের বৈধতা ও কার্য্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি হইতে তাহাদের প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব * * *

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক উভয়ের দৃষ্টি লইয়া

প্রেমের যে বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে নিতান্ত দুর্লভ। আবার, ব্যর্থ, প্রতিহত প্রেম জীবনকে যে একটী বৃহৎ দুঃখে অভিষিক্ত করে ও মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুরে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাকেও তিনি আশ্চর্য্য গভীর সহানুভূতির দ্বারা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

যে-সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', মধ্যবর্ত্তিনী, শাস্তি, 'প্রায়শ্চিত্ত' 'দুরাশা' 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'। * * *

'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, ইহা কেবল প্রলয়-দুর্য্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। * * 'দুরাশা' গল্পটিতে সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের স্পর্শ ও যথেষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে মহামহনীয় প্রেমের আত্মকাহিনী। * * * 'অধ্যাপক' গল্পটীর অনেকগুলি দিক আছে—একটী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দিক। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতার মধ্যে যে বিদ্রূপ-রসটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু ইহার প্রধান বাণীটী প্রেমের—প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শ্রীর সহিত সুন্দরী নারীর যে একটি নিগূঢ় প্রাণময় ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কবিপ্রতিভার সৃষ্টি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। * * *

'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম-সৌরভের ন্যায় নারীহৃদয়ের একটি অনুপম সংযত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ—রমণীসুলভ কোমলতা একটি স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মত সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। * * *

কি পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনায়, কি জীবনের সমালোচনাতে সর্ব্বত্রই এই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অন্ধের স্বচ্ছ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-বোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রশংসার অতীত। একটিমাত্র উদাহরণ দিব—'অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্ব্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম ; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।' এই যে গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি—বোধ হয় চক্ষুহীন ভিন্ন ইহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। গল্পটি পড়িলে মনে হয় যেন লেখক আপনার চক্ষুষ্মান প্রকৃতির সমস্ত সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া, পুরুষের সমস্ত শিক্ষাভিমান ও বুদ্ধিবিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া এই পরম রমণীয়, সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, স্বচ্ছ অন্ধলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়ছেন।

'মধ্যবর্ত্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কি করিয়া তিনটি নিতান্ত সাধারণ যন্ত্রবদ্ধ জীবন যাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্ছেদ্য জটিলতা আনিয়া দিয়াছে তাহারই কাহিনী ইহার বিষয়। আপিস ও গৃহস্থালীর লৌহনিগড় বদ্ধ চিরাভ্যস্ত জীবনের নিতান্ত বাঁধা ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দ্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্ব্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছে। হর সুন্দরী প্রৌঢ় বয়সে এই অকাল-জাগ্রত, বুভুক্ষু মনোবৃত্তির অতর্কিত পরিচয় লাভ করিয়া নিজের লৌকিক কর্ত্তব্যরত অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও প্রবঞ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আর এই গল্পের তৃতীয়

ব্যক্তি শৈলবালা প্রেমের অপরিমিত আদর ও অযাচিত সোহাগ অনায়াসে লাভ করিয়া জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অকালমৃত্যুর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনীটি আমাদের বাঙালী পরিবারের অতিসাধারণ ঘটনা। কিন্তু লেখক এই অতিসাধারণ ঘটনার মধ্যেও কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত গভীর রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যবোধ হয়। * * *

'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজোপূর্ণ চরিত্রটি, অভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, সুদূর রহস্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; * * *

'সম্প্রদান' গল্পটিতে হরিণ শিশুর ন্যায় উদার, সরল, লৌকিক বোধহীন বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জাকুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা উপলক্ষ্যে লেখক বেদনারহস্যমণ্ডিত মানবহৃদয়ের সহিত সতঃউৎসারিত আনন্দনির্ঝরস্নাত ইতরপ্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ তুলনা করিয়াছেন! * * *

পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিপর্য্যয়, এক বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের সৃজন হইয়া থাকে। স্নেহ প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয় বৃত্তি, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজ নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাহে বলিয়াই রোমান্সের উদ্ভব হইয়া থাকে। * * * 'কাবুলীওয়ালা'তে এই স্নেহ বন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক রুক্ষদর্শন, পরুষমূর্ত্তি বিদেশীর সহিত বাঙালী ঘরের একটি ছোট মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে। * * *

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের

সহায়তাবিধানে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-শক্তির বলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্য্যকলাপ বা চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃ প্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্য্যরূপ রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। * * *

ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, সাঙ্কেতিকতায় এক De Quinceyর Dream Visions ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত প্রবাহে বোধ হয় De Quincey রবীন্দ্রনাথ হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ইংরেজ লেখকের যে প্রধান দোষ বস্তুহীনতা ও ভাবের কুহেলিকাময় অস্পষ্টতা—তাহার লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবৃতি হইয়াছে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে, ট্রেন প্রতীক্ষার অবসরে।

আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনা প্রণালী পূর্ব্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন। * * পূর্ব্ব গল্পগুলি আমাদের সনাতন জীবন যাত্রার গভীর মর্ম্মস্থল হইতে উদ্ভূত। এক একটি গল্প যেন তাহার হৃদ-পদ্মের এক একটি বিকশিত পাপড়ি। ইহাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের গভীর রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কেবলমাত্র জীবনের উপরিভাগে একটা বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। নূতন গল্পগুলির মধ্যে এই বাহিরের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা হইয়াছে। হয়ত লেখক অনুভব করিয়াছিলেন যে পুরাতন রসধারা শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে আর নূতন কিছু করিবার সম্ভাবনা অল্প। * * এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও পূর্ব্বসূচনকারী।

ইহাদের মধ্যে 'নষ্টনীড়' গল্পটী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনাকাল হিসাবে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পগুলির সমসাময়িক, কিন্তু বিষয়ের দিক হইতে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্পগুলির সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। * * * সুতরাং সাহিত্যে এই নূতন আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভাব হয় নাই। * * * কলাসৌন্দর্য্য ও বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলে প্রেমের এই সমস্ত সমাজ-বিগর্হিত বিকাশ ও সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে—বিপদ সেইখানে, যেখানে ইহাকে কেবলমাত্র কুৎসিৎ আলোচনার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে কল্পনার স্বচ্ছসলিলে ইহার কালিমাকে ধৌত করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না। * * *

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটাও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্ম্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ। কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁজের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা পুরুষের স্ত্রীজাতির উপর কাপুরুষোচিত আস্ফালন ; সমাজচ্যুতার বিবাহে বিঘ্ন নহে। * * *

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তাহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। * * * রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বীজ বপন করিয়াছেন তিনি নিজে, কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহার পরিণত ফল কোন্ ভাগ্যবান আহরণ করিবে তাহা এখন আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার আগমন

প্রতীক্ষায় সমগ্র দেশ অনিমেষ নয়নে ভবিষ্যৎ কালের দিকে চাহিয়া থাকিবে।"

সাহিত্যে শ্লীলতারক্ষা বিশ্লেষণকালে কবিরঞ্জন যতীন্দ্র মোহন সিংহ লিখিয়াছেন—"আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কবিগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে চিরদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। * * স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি। * * কিন্তু কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীকে কবি নায়িকার আসন দেন নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া তিনি সমাজের উপকার সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

* * বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা পাইয়াছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিধবা-চরিত্র—'চোখের বালি'র বিনোদিনী। * * * প্রেমের খেলা জিনিষটা কখনও হিন্দুর গৃহে প্রচলিত ছিল না, ঘরের বাহিরে অবশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে হিন্দুগৃহে তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। * * গ্রন্থকার মহেন্দ্র, বেহারী, বিনোদিনী ও আশাকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছেন। * *

বিনোদিনী বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল—'জীবনসর্ব্বস্ব, জানি, তুমি আমার চিরকালের নও,—কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভালবাস! তারপর আমি আমাদের সেই বনজঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছু চাহিব না। মরণ পর্য্যন্ত রাখিবার আমায় কিছু একটা দেও।' বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনায় নবেলী প্রেম চরম মাত্রায় (climax) উঠিয়াছে। ইহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' শিশুর আলিঙ্গন। * * *

গ্রন্থকার একজন হিন্দুবিধবাকে পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়া ও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রায় পনের আনা ভাগে পাপের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ পাপচিত্রের সহিত পাঠক পাঠিকার মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, পাপের প্রতি ঘৃণাও ক্রমে কমিয়া আসে। এই হিসাবে এই গ্রন্থ সমাজ-শরীরের পক্ষে বিষস্বরূপ। * * *

এবার আমরা বিবাহিতা স্ত্রীর পরকীয় প্রেমাসক্তির বিষয়ে আলোচনা করিব। * * কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথই এইরূপ চিত্রের পথপ্রদর্শক। * * 'নষ্টনীড়ে' যাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়' ও 'চোখের বালি'র একটা মিলিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে—— তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'। * *

ভারতচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য মাটীর তলে সুড়ঙ্গ কাটার কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিবাহিত স্ত্রীর মনের মধ্যে পরপুরুষের ধ্যানের জন্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের পথ দেখাইয়াছেন। * * তাঁহার অনুকরণকারীরা ইহার পরে অনেক দেবর-বৌঠা'নের সঙ্গে প্রেম ঘটাইয়াছেন ও ঘটাইতেছেন। এই সকল, সাহিত্য-সমাজ শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * *

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্ট-নীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)। * *

এই গ্রন্থে নিখিল, বিমলা ও সন্দীপ ইহার কেহই মানুষ হয় নাই ; * * এতদূর পাশবতা, এতদূর নির্লজ্জতা, এতদূর কাপুরুষতা প্রকৃত মানুষে কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না,—সন্দীপ প্রকৃতই একটা দানব বা রাক্ষস। * * সন্দীপের ন্যায় অতিমানুষ (super-human) দানব লইয়া পুরাণ রচনা চলে, কিন্তু উপন্যাস রচনা ব্যর্থ হয়। * * এই